মৌলিক পদার্থ

সৈয়দ মোহাম্মদ ছালেহ্‌উদ্দিন

banglainternet.com

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক
মহিউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭ জিন্দাবাহার ১ম লেন ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
অগ্রহায়ণ ১৩৯৫/ডিসেম্বর ১৯৮৮

মুদ্রাকর
মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭ জিন্দাবাহার ১ম লেন ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

মূল্য
পঁচিশ টাকা মাত্র

গ্রন্থমালা পরিকল্পনা ও সমন্বয়
মুস্তাফা পাম্পা

banglainternet.com

প্রকাশকের নিবেদন

আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানেরই অবদান। প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা জল-স্থল-অন্তরীক্ষ-মর্ত-পাতাল;—এককথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বিপুলে বিস্ময় ও রহস্য উন্মোচনে তৎপর থেকেছেন। অগণন বিজ্ঞানীর সাধনা, নিগ্রহভোগ ও জীবনদানের ফলে এই শতাব্দীতে এসে বিরুদ্ধ প্রকৃতির ব্যাপক অংশই মানুষের আয়ত্তে। আজ বহু প্রশ্নের জবাব দিতে মানুষ সক্ষম। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আমরা ভোগ করছি বিজ্ঞানীদের অনলস শ্রমের ফসল। পাশাপাশি বিজ্ঞানের যে অপপ্রয়োগ হচ্ছে না তা নয়। এর পরও বিজ্ঞান আমাদের কল্যাণকর বিশ্ব উপহার দেবে, এ আশা আমরা করতে পারি।

প্রায় সকল উন্নত দেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা দেয়া হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষাদান জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু বাংলায় বিজ্ঞানের বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। বিশেষ করে 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান'-এর বই হাতে গোনার মতো।

আমরা বিশ্বাস করি, দেশের মানুষ যতই বিজ্ঞানমনস্ক হবে তার সনাতন কুসংস্কার দূর হবে তত দ্রুত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা প্রকাশ করছি 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা গ্রন্থমালা'। স্বাধীন বাংলাদেশে এ ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম। আমরা আশা করছি, আমাদের এই সীমিত প্রয়াস শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের কৌতূহল সম্পূর্ণ না-হলেও খানিকটা মেটাতে সক্ষম হবে।

এই গ্রন্থমালায় যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। যার ফলে আমরা বলতে পারি যে প্রতিটি বিষয়ের তথ্য সঠিক ও উপস্থাপন যথাযথ হয়েছে। তবুও বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কিছু নেই। নতুন নতুন আবিষ্কার প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানকে করে তুলছে আরও সমৃদ্ধ। তাই, যদি কোনো ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা কারু নজরে পড়ে আমাদের জানালে পরবর্তীতে সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যাঁরা এই গ্রন্থমালায় লিখেছেন তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মহিউদ্দীন আহমদ

মৌল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে যা-ই দেখি-না কেন একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে সহজেই বুঝা যাবে যে এই সকল বস্তু, যেমন ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, বাসনপত্র, কাগজকলম সব কিছুই কতগুলো রাসায়নিক মৌল দিয়ে গঠিত। অর্থাৎ এই বিশ্বের সকল পদার্থের মূলেই আছে রাসায়নিক মৌল। আর এই রাসায়নিক মৌল হলো এমন একটি পদার্থ যা সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভেঙে নতুন কোনো পদার্থে পরিণত হয় না কিংবা নতুন পদার্থ সৃষ্টি করে না।

বর্তমানে প্রায় ১০৬টি রাসায়নিক মৌলের পরিচয় আমাদের জানা। তবে এই মৌলগুলি আবার নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে অথবা একাধিক মৌল অন্য কোনো মৌলের সঙ্গে একত্রিত বা সংযুক্ত হয়ে জটিল পদার্থ তৈরি করে। এদেরকে যৌগিক পদার্থ বলা হয়। এদের সম্ভাব্য সংখ্যা অনেক। প্রতিদিনই নতুন নতুন বহু যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত হচ্ছে।

দুই বা ততোধিক মৌল একত্রিত হয়ে কোনো নতুন যৌগিক পদার্থ তৈরি করলে এই যৌগিক পদার্থের নতুন গুণাবলী মূল মৌলগুলির গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়।

উদাহরণ হিসেবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই গ্যাস দুটিকে দেখা যাক। এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ধর্ম আছে। যেমন হাইড্রোজেনের গলনাঙ্ক মাইনাস ২৫২·৮° সেলসিয়াস আর অক্সিজেনের গলনাঙ্ক মাইনাস ১৮২·৯° সে.। বিশেষ বিক্রিয়ায় এই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন হয়। এই পানি সাধারণ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মতো গ্যাস নয় বরং তরল। আর মাত্র ০° সে. তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ পানির ধর্মাবলী মূল মৌল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই পানি মৌলিক নয় বরং যৌগিক পদার্থই। কারণ পানিকে সহজেই বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। অথচ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে সরাসরি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে ভেঙে নতুন কোনো পদার্থ তৈরি করা অসম্ভব। তাই এরা মৌল বা মৌলিক পদার্থ।

প্রকৃতিতে যে সকল পদার্থ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অধিকাংশই যৌগিক পদার্থের সমাহার। যেমন, সাগরের পানি। এই পানি সাধারণ পানি ও বহুসংখ্যক যৌগিক পদার্থের বিশেষ করে আমরা যে লবণ খাই তার মিশ্রণ। যৌগিক পদার্থ ও মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য হলো মিশ্র পদার্থকে সহজেই কোনো সাধারণ ভৌত প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাদের উপাদানে ভাগ করা যায়, কিন্তু যৌগিক পদার্থের বেলায় তা সম্ভব নয়। যেমন সাগরের পানিকে বাষ্পীভবন করে যৌগিক মিশ্রণ থেকে আলাদা করে পানি পাওয়া সম্ভব; কিন্তু পানিকে বাষ্পীভবন করে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পাওয়া অসম্ভব।

মৌল সম্বন্ধীয় ধারণার ক্রমবিকাশ

মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থের আধুনিক ধারণা সুস্পষ্ট। আমাদের চারপাশের বিদ্যমান সকল বস্তুর সৃষ্টিতে যে সব পদার্থের প্রয়োজন তাদের অস্তিত্ব নিয়ে তাত্ত্বিক জল্পনাই ছিল ইতিহাসের শুরু। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক থালিসের মতে পানি থেকেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে। অ্যানাক্সিমিনীজের মতে বায়ুই বিশ্বের সব কিছুর মৌলিক পদার্থ। একই মূল পদার্থের ঘনত্বের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি হয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। আর হেরাক্লাইটাসের মতে অগ্নিই ছিল বিশ্বের ভিত্তিমূলক পদার্থ। অপর গ্রীক দার্শনিক এমপেডোকলীজ এই মর্মে অন্য ধারণা ব্যক্ত করেন যে, সকল বস্তুই বায়ু, মাটি, আগুন ও পানির সমন্বয়ে গঠিত। অ্যারিস্টটল এমপেডোকিলীজের ধারণাকে জোড় সমর্থন করে বললেন, এই চারটি মৌলই সকল পদার্থের মূল ধর্মের বাহক হিসেবে কাজ করে। যেমন শুষ্কতা ও তাপ আগুনের, তাপ ও আর্দ্রতা বাতাসের, আর্দ্রতা ও ঠাণ্ডা পানির এবং ঠাণ্ডা ও শুষ্কতা মাটির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই দার্শনিকদের ধারণায় উল্লিখিত চারটি তথাকথিত মৌলিক পদার্থ দ্বারাই অন্য সকল বস্তু গঠিত এবং সকল বস্তুর ধর্মাবলী কেবল তাদের মৌলিক বৈশিষ্টাই প্রকাশ করে। গ্রীক দার্শনিকদের মৌল সম্পর্কীয় ধারণা প্রায় দু হাজার বছর ধরে অপ্রতিহত ছিল। মৌলের আধুনিক ধারণার কেবল একটি মাত্র দিক, প্রতিটি মৌলের বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম আছে, এই প্রাচীন সংজ্ঞায় ছিল।

মধ্যযুগের শেষদিকে যখন রাসায়নিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলকেমিস্টদের ধারণা আরও স্পষ্ট হয় তখন পদার্থের উপাদান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রীকদের

ধারণা আর সন্তোষজনক রইলো না। নতুন আবিষ্কৃত পদার্থসমূহের রাসায়নিক রূপান্তরের বর্ণনার জন্য অতিরিক্ত গুণাগুণের সংযোজন হলো। যেমন, গন্ধক দাহ্যতার গুণ প্রকাশ করল, পারদ উদ্বায়িত্বের (Volatility) অথবা তরলতার (Fluidity), আর লবণ আগুনে কোনো বস্তুর অদাহ্যতার (incombustibility)। আলকেমিস্টদের আবিষ্কৃত এই তিনটি মৌল কোনো ভৌত পদার্থ প্রকাশ না-করে কেবল তার প্রকৃতিই বর্ণনা করতো।

শেষ পর্যন্ত যখন মিশ্রণ এবং রাসায়নিক যৌগের মূল পার্থক্য বোধগম্য হলো তখন ১৬৬১ সালে ইংরেজ রসায়নবিদ্ রবার্ট বয়েল রাসায়নিক মৌলের মূল প্রকৃতি সমর্থন করে মন্তব্য রাখেন। যুক্তিসহকারে বুঝালেন যে গ্রীক দার্শনিকদের মতানুযায়ী পদার্থের মূল উপাদান হিসেবে যে চারটি মৌলকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারা কিছুতেই পদার্থের মৌলিক উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে না। কেননা তারা যেমনি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কোনো নতুন পদার্থ তৈরি করতে পারে না তেমনি অন্য কোনো পদার্থ থেকেও তাদেরকে নিষ্কাশন করা সম্ভব নয়। বয়েল মৌলের ভৌত ধর্মাবলী উল্লেখ করে যৌগের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের আধুনিক ধারণা তুলে ধরলেন।

১৭৮৯ সালে ফরাসী রাসায়বিদ্ ল্যাভোসিয়ার বয়েলের সংজ্ঞানুযায়ী সম্ভাব্য সকল মৌলের একটি তালিকা প্রকাশ করলেন। একেই রাসায়নিক মৌলের প্রথম তালিকা বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। ল্যাভোসিয়ার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পুনর্যোজন ও বিযোজন বিক্রিয়ার মাত্রিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক এই তালিকা তৈরি করেছিলেন। ল্যাভোসিয়ার তাঁর মৌলের তালিকায় চুন, অ্যালুমিনা ও সিলিকাকে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা এখন জানি চুন, অ্যালুমিনা ও সিলিকা আসলে যৌগ, তবে তারা অনেক মৌলের চেয়েও স্থায়ী।

প্রাচীনকালের জানা সাতটি মৌল যেমন সোনা, রুপা, তামা, লোহা, সীসা, টিন ও পারদ আজ পর্যন্ত মৌল হিসেবেই স্বীকৃত। কারণ প্রথম থেকেই প্রকৃতিতে তুলনামূলক বিশুদ্ধ অবস্থায় এদের পাওয়া যেত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন কোনো যৌগ থেকে মৌলের পৃথকীকরণ পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের আয়ত্তে আসে তখন অপর ষোলটি মৌল আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীতে মাত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও তিরাশিটি নতুন মৌল আবিষ্কৃত হয়।

banglainternet.com

মৌলের বিস্তার

প্রাথমিকভাবে পার্থিব ও মহাজাগতিক পদার্থের বিভিন্ন রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখা গিয়েছে যে উল্কাপিণ্ডের রাসায়নিক উপাদান সূর্য এবং নক্ষত্রের রাসায়নিক উপাদানেরই মতো। সূর্যে এবং নক্ষত্রে হালকা মৌল যেমন হাইড্রোজেন (৯০%) ও হিলিয়ামের উপস্থিতি ব্যাপক। আর পৃথিবীর কঠিন আবরণে অক্সিজেনের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। বাতাসে তা মুক্ত অবস্থায়, পানি এবং বহু ধাতুর অক্সাইডে, যেমন সিলিকা, ম্যাগনেসিয়া, অ্যালুমিনা ও লোহার অক্সাইডে যৌগিক অবস্থায় থাকে। পৃথিবীর কঠিন স্তরের বহুলাংশ এই অক্সাইডসমূহ দ্বারাই গঠিত। যদি পৃথিবীকে তার মূল উপাদানে ভাগ করা হয় তাহলে বিভিন্ন মৌলের পরিমাণ দাঁড়াবে, যেমন: অক্সিজেন (৪৯.৯%), সিলিকন (২৬০%), অ্যালুমিনিয়াম (৭.৩%), লোহা (৪.১%), ক্যালসিয়াম (৩.২%), সোডিয়াম (২.৩%), পটাসিয়াম (২.৩%), ম্যাগনেসিয়াম (২.১%) ও অন্যান্য মৌলসমূহ (২.৮%)।

জীবজগতের প্রায় ৯৯ ভাগেরও বেশি বস্তু মাত্র দশটি মৌল দ্বারা গঠিত: অক্সিজেন (৬২%), কার্বন (২০%), হাইড্রোজেন (১০%), নাইট্রোজেন (৩%), ক্যালসিয়াম (২.৫%), ফসফরাস (১.১৪%), ক্লোরিন (০.১৬%), গন্ধক (০.১৪%), পটাসিয়াম (০.১১%) ও সোডিয়াম (০.১০%)। উল্লিখিত মৌলগুলো ছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, দস্তা, বোরন, মোলিবডিনাম, আয়োডিন এবং কোবাল্টের যৌগ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য অতি প্রয়োজনীয়, যদিও অনেকক্ষেত্রেই এদের পরিমাণ খুব কম হয়। তাছাড়া সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, গ্যালিয়াম, ফ্লোরিন, বেরিয়াম এবং স্ট্রনসিয়াম উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে প্রয়োজনীয় বলে ধারণা করা হয়। উদ্ভিদ কোষে (৭৫% পানি) ও প্রাণিকোষে (৬৭% পানি) পানিরূপে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

banglainternet.com

ধাতু কি ?

ধাতু কি ? এই প্রশ্নের জবাব দেয়া কঠিন ব্যাপার। বর্তমানে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে ধাতু সম্বন্ধে অনেক বেশি জানি। তথাপি অনেক প্রশ্নের জবাব এখনও আমরা খুঁজে পাই নি। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কেননা ধাতুর বিজ্ঞান এখনও তরুণ। দুশো বছরেরও কিছু আগে রুশ

বিজ্ঞানী লমোনসভ (১৭১১—১৭৬৫) ধাতুর সংজ্ঞা দিলেন এ রকম : ধাতু এক প্রকার নরম ও উজ্জ্বল বস্তু। তখনকার জন্য এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাই ছিল যথেষ্ট নির্ভুল। লমোনসভ শুধু সোনা, রুপা, তামা, লোহা, সীসা ও টিনকে ধাতু হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রাচীনকাল থেকেই পারদ ও অ্যান্টিমোনি পরিচিত ছিল। পারদ তরল আর অ্যান্টিমোনি যথেষ্ট ভঙ্গুর। তাই একে পিটিয়ে পাতলা পাত তৈরি করা যায় না বলে লমোনসভের সজ্ঞানুযায়ী এদেরকে ধাতু বলা গেল না। পরবর্তীতে ধাতুর সংজ্ঞায় তার কিছু নতুন গুণাবলী যোগ করা হয়। যেমন জার্মান বিজ্ঞানী মাইয়ারের (১৮৯৭) বিশ্বকোষে ধাতুর সংজ্ঞায় বলা হয় ....."ধাতু হবে এমন সব মৌল যারা তাপ ও বিদ্যুতের উত্তম পরিবাহক, বৈশিষ্ট্যমূলকভাবে উজ্জ্বল ও অস্বচ্ছ এবং অক্সিজেনের সঙ্গে ক্ষারকীয় অক্সাইড গঠন করবে"। বর্তমানে অবশ্য ধাতুর এই সংজ্ঞায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে তার তাপীয় পরিবাহিতা ও তড়িৎ-পরিবাহিতা হ্রাস পাওয়ার ধর্মও যোগ করা হয়।

পর্যায় সারণীর ১০৬টি মৌলের ১১টি হচ্ছে গ্যাস, ২টি তরল আর বাকিগুলি কঠিন পদার্থ। সর্বমোট প্রায় ৮৪টি মৌলকে ধাতুর শ্রেণীভুক্ত করা যায়। প্রতিটি ধাতুরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। কোনো কোনো ধাতুকে তাদের ধর্মের সাদৃশ্যভিত্তিক এক এক গ্রুপে ভাগ করা হয়। এমনি একটি গ্রুপের অন্তর্গত অভিজাত ধাতুসমূহ : সোনা, রুপা, প্লাটিনাম ইত্যাদি। এদের অভিন্ন ধর্ম হলো ধাতুগুলো বায়ুতে খুব স্থায়ী এবং উজ্জ্বলতার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

বিভিন্ন ধাতুর গুণাবলী তুলনা করলে এদের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্যও ধরা পড়ে। যেমন বিভিন্ন ধাতুর গলনাঙ্কে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পারদ সাধারণ তাপমাত্রায় তরল, কিন্তু মাত্র মাইনাস ৩৮.৫° সে.-এ জমাট বাঁধতে শুরু করে। গ্যালিয়াম হাতে রাখলেই গলা শুরু করে। এর গলনাঙ্ক ২৯.৫° সে.। আর টাঙ্গস্টেনকে গলাতে ৩৪৫০° সে. পর্যন্ত তাপ দেয়া প্রয়োজন।

সংজ্ঞানুযায়ী ধাতু তড়িৎ-পরিবাহক। রুপা ও লোহার জন্য তা সহজেই অনুমেয়। তবুও লোহার তুলনায় রুপার তড়িৎ-পরিবাহিতা ছয় গুণ বেশি। কিন্তু জার্মেনিয়ামের তুলনায় লোহার তড়িৎ-পরিবাহিতা কয়েক হাজার গুণ বেশি। সুতরাং বিভিন্ন ধাতুর বেলায় তড়িৎ-পরিবাহিতায়ও অনেক তার-

banglainternet.com

এভাবে ধাতুর আরও অনেক গুণাবলীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা তেমন কঠিন নয়। তবে প্রশ্ন হলো ধাতুর সংজ্ঞায় তার সাধারণ গুণাবলী না বৈসাদৃশ্যমূলক গুণাবলী প্রাধান্য পাবে? জবাব একটিই, অবশ্যই সাধারণ গুণাবলী। কিন্তু সঠিকভাবে এ সকল গুণাবলী নিরূপণের জন্য সকল ধাতুকে কোনো-না-কোনো উপায়ে সুশৃঙ্খল করা প্রয়োজন। সকল ধাতুই রাসায়নিক মৌল। সুতরাং তাদেরকে রাসায়নিক মূলনীতির ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করাই শ্রেয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মৌলের পর্যায় সারণী ব্যবহার করা।

রাসায়নিক মৌল হিসেবে ধাতু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার আগে একটা জটিল প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন। প্রশ্ন জাগতে পারে রাসায়নিক মৌলই যদি ধাতু হয় তাহলে ইস্পাত, কাঁচা লোহা, ব্রোঞ্জ ও পিতল, অর্থাৎ সকল সঙ্করধাতু কি ধাতু নয়? অবশ্যই তা বলা যাবে না। অধিকাংশ ধাতুই খাঁটি অবস্থায় ব্যবহার না-করে সঙ্করধাতু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে এ বইতে আমরা ধাতুর গুণাবলী সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভের জন্য কেবল খাঁটি ধাতু নিয়েই আলোচনা করব।

পর্যায় সারণীতে মৌলগুলিকে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক সংখ্যার ভিত্তিতে সাজান হয়েছে। মাইয়ার (১৮৩০—১৮৯০) ও মেনডেলিভ (১৮৩৪—১৯০৭) যখন পৃথকভাবে পর্যায় সারণী তৈরি করেন তখন পারমাণবিক কাঠামোর বর্তমান মডেল জানা ছিল না। মৌলগুলির পারমাণবিক ওজন পর্যায় সারণীতে তাদের স্থান নির্দেশ করতো। কিন্তু তখনকার পরিচিত ৬৩টি মৌলের মধ্যে মাত্র ৩৬টি মৌল ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ওজনের মূলনীতি মেনেছিল। ২০টি মৌল সম্পূর্ণরূপে এই মূলনীতি মানে নি। পর্যায় সারণীতে মৌলগুলির সঠিক স্থান কেবল তাদের ভৌত ধর্ম অর্থাৎ পারমাণবিক ওজন ভিত্তিক নির্ধারিত না-হয়ে অন্যান্য গুণের ভিত্তিতেও হওয়া প্রয়োজন। এই ধারণা থেকে মেনডেলিভ বাকি ৭টি মৌলের পারমাণবিক ওজন সংশোধন করেন। পরবর্তীকালে এই বুনিয়াদি মূলনীতির পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার মেনডেলিভকে এগিয়ে নিয়েছিল এক অসাধারণ আবিষ্কারের পথে। তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তৎকালে অনাবিষ্কৃত এমন কিছু মৌলের সম্ভাব্য গুণাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা।

পর্যায় সারণীর পর্যাবৃত্তি অনুধাবনের জন্য পরমাণুর মডেল ও পর্যায় সারণীতে মৌলের স্থানের সম্পর্ক বুঝা দরকার। নিলস বোরের (১৮৮৫—১৯৬২) পারমাণবিক মডেল তা বুঝতে সাহায্য করে। উক্ত পারমাণবিক

মডেলটি সৌরজগতের ক্ষুদ্রাকৃতি মডেলটি স্মরণ করিয়ে দেয়। পরমাণুর কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াস থাকে তাকে সূর্য হিসেবে দেখতে পারি। আর এই নিউক্লিয়াসের চারপাশে সেল থাকে। এই সেলে পরমাণুর কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে। নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে এই ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনগুলোকে সৌরজগতের গ্রহরূপে ধরে নেয়া যায়। পরমাণুর আয়তন এতই ছোট যে তা কল্পনা করাই কঠিন। দশ কোটি পরমাণুকে একটির পর একটি করে সাজালে মাত্র এক সেণ্টিমিটার লম্বা হবে। সৌরজগতে যেভাবে সূর্যের অনেক দূরে অবস্থিত নিজ নিজ কক্ষপথে গ্রহগুলি ঘোরে, পরমাণুতেও তেমনি নিউক্লিয়াসের (পরমাণুর আয়তনের তুলনায়) অনেক দূরে অবস্থিত সেলে পরমাণুর কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলি ঘোরে। সূর্যের ব্যাস ($১·৪\times১০^{৬}$ কিলোমিটার) ও সৌরজগতের আয়তনের (৬×১০^{১৭} কিলোমিটার) অনুপাতের মতোই নিউক্লিয়াসের ব্যাস ($\sim১০^{-১৩}$ সেণ্টিমিটার) ও পরমাণুর আয়তনের ($\sim১০^{-৮}$ সেণ্টিমিটার) অণুপাত।

এই অনুপাতের মান সহজভাবে বুঝবার জন্য ধরা যাক, পরমাণুর ব্যাস ১০০ মিটার। তখন নিউক্লিয়াসের ব্যাস হবে মাত্র ১ সেণ্টিমিটার আর ইলেকট্রনের ১ মিলিমিটার। ১ ঘনমিটার আয়তনের প্লাটিনামকে (২১৫০০ কিলোগ্রাম) যদি নিউক্লিয়াসের আয়তন পর্যন্ত কমান সম্ভব হয় (যেহেতু নিউক্লিয়াসের ওজন আর পরমাণুর ওজন প্রায় সমান) তাহলে তার আয়তন হবে মাত্র ১ ঘনমিলিমিটার।

নিউক্লিয়াস শুধু পরমাণুর ওজনই নয় তা পরমাণুর ধনাত্মক চার্জও বটে—কেননা নিউক্লিয়াসেই ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট প্রোটন থাকে। নিউক্লিয়াসের এই প্রোটনের সংখ্যাকেই পারমাণবিক সংখ্যা (Z) বলা হয়। এই পারমাণবিক সংখ্যা Z পর্যায় সারণীতে উক্ত পরমাণুর স্থান নির্দেশ করে। প্রোটনের সমান সংখ্যক ইলেকট্রন (ঋণাত্মক চার্জ) পরমাণুর সেলে অবস্থান করে। ফলে মোটের উপর পরমাণু চার্জ-নিরপেক্ষ (Neutral) থাকে। নিউক্লিয়াসে প্রোটন ছাড়া নিউট্রনও থাকে। যে সকল পরমাণুর একই পারমাণবিক সংখ্যা অথচ নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন তাদেরকে আইসোটোপ বলে।

নিলস বোর ১৯১৩ সালে তার বিখ্যাত হাইড্রোজেন পরমাণু মডেল আবিষ্কার করেন। পরমাণু সম্বন্ধীয় তত্ত্বে তিনি বলেন যে, পরমাণুতে

এমন কতগুলো স্থায়ী সেল বা কক্ষপথ আছে যে পথে আবর্তনকালে ইলেকট্রন কোনো শক্তি বিকিরণ করে না। নিউক্লিয়াসের চার্জ অর্থাৎ প্রোটন-সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এক এক পরমাণুর সেলগুলো ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে। তবে এই সময় সর্বপ্রথমে নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী সেলটি পূর্ণ হয়। এরপর দ্বিতীয়টি, পরবর্তীতে তৃতীয়টি, এভাবে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী সেলগুলি পূর্ণ হয়।

মোটের উপর পরমাণুর বিভিন্ন সেলে ইলেকট্রন বণ্টনের উপর নির্ভর করে উক্ত পরমাণুর বিভিন্ন গুণাগুণ। চূড়ান্তভাবে মৌলের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষমতাও নির্ভর করে তার নিজ সেল থেকে অন্য মৌলকে ইলেকট্রন দেয়া অথবা অন্য মৌল থেকে নিজ সেলে ইলেকট্রন গ্রহণ করার উপর। অ্যালকালি ধাতুর বহিস্থ সেলে মাত্র একটি ইলেকট্রন থাকে। অন্যান্য ইলেকট্রনের তুলনায় এই ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়াসের সাথে খুব দুর্বলভাবে আবদ্ধ থাকে। তাই অ্যালকালি ধাতুর পরমাণু সহজেই একটি ইলেকট্রন অন্য কোনো মৌলকে দিয়ে ধনাত্মক আয়ন Li^+, Na^+, K^+ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। উল্টোভাবে ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন মৌলগুলির পরমাণুর বহিস্থ সেলে মাত্র একটি ইলেকট্রনের অভাবে পরমাণু স্থায়ী হতে পারে না। তাই সহজেই তারা একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Cl^-, F^-, Br^- ঋণাত্মক আয়নে রূপান্তরিত হয়। ধাতুর বৈশিষ্ট্য হলো ধনাত্মক আয়ন তৈরি করা। পর্যায় সারণীতে বাম থেকে ডান দিকে মৌলগুলির এই ধর্ম হ্রাস পায়। অর্থাৎ সকল অধাতু পর্যায় সারণীর ডান দিকে স্থান পেয়েছে। মৌলের ধাতব ধর্ম পর্যায় সারণীতে উপর থেকে নিচের দিকে বৃদ্ধি পায়। তবে পর্যায় সারণীতে ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো সীমানা নির্দেশ করা কঠিন। কোনো কোনো মৌল একই সময়ে ধাতু ও অধাতু হিসেবে আচরণ করতে পারে। যেমন টিনের ধাতব রূপ ছাড়াও একই সময়ে অধাতব রূপান্তরও থাকে। সেলিনিয়ামের স্থায়ী ধাতব রূপ ছাড়াও দুটি স্বল্পস্থায়ী অধাতব রূপান্তর দেখা যায়। পর্যায় সারণীতে যে সকল মৌল ধাতু ও অধাতু উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করে, যেমন আর্সেনিক, অ্যান্টিমোনি, বিসমাথ—তারা উপধাতু নামে পরিচিত।

banglainternet.com

প্রাকৃতিক ধাতু

লিথিয়াম (Li), Z=৩

১৮১৭ সালে বিজ্ঞানী আর্ফভেডসন (Arfvedson) পিট্যালাইট খনিজ পদার্থে এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন। পাথরে এই ধাতুটি বিদ্যমান থাকে বলে গ্রীক শব্দ লিথোস (Lithos—পাথর) থেকে একে লিথিয়াম (Lithium) নামকরণ করা হয়। ক্ষার ধাতুর অন্তর্গত লিথিয়াম খুব নরম এবং সর্বাপেক্ষা হালকা। পর্যায় সারণীর ক্ষার ধাতু শ্রেণীর প্রথম স্থানে লিথিয়ামের অবস্থান।

ভূত্বকে লিথিয়াম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। পিটালাইট (Petalite), অ্যামব্লিগোনাইট (amblygonite), স্পোডিউমেন (Spodumene), লেপিডোলাইট (Lepidolite) ইত্যাদি আকরিকে সোডিয়াম, পটাসিয়াম অথবা অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অল্প পরিমাণে মিশ্র অবস্থায় লিথিয়াম পাওয়া যায়। শিলামণ্ডলে তার পরিমাণ ৬.৫$\times$১০$^{-৫}$%, ভূত্বকে ৫$\times$১০$^{-৩}$% ও পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ৩$\times$১০$^{-৪}$%। প্রাকৃতিক লিথিয়ামের দুইটি আইসোটোপ দেখা যায়।

লিথিয়ামের গলনাঙ্ক ১৮৬° সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ১৩৩৬° সে.। এটি শক্তিশালী বিজারক। তাই সহজেই পানিকে ভেঙে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত করে। লিথিয়ামের এই ধর্মটি ব্যবহার করে অনেক ধাতুর অক্সাইডকে বিজারিত করে মূল ধাতুগুলি বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। লিথিয়ামের বাষ্প অগ্নিশিখাকে উজ্জ্বল লাল বর্ণে রঞ্জিত করে। তাই একে আতশবাজিতে ব্যবহার করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম, সীসা ও বেরিলিয়ামের সঙ্গে এর মিশ্রণে কতিপয় সঙ্কর ধাতু পাওয়া যায়। লিথিয়ামের কতিপয় লবণ সঞ্চয়ী তড়িতাধারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর বেশ কিছু যৌগ ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

banglainternet.com

বেরিলিয়াম (Be), Z=৪

১৭৯৮ সালে বিজ্ঞানী ভকেলিন (Vauquelin), বেরিল (Beryl) ও স্মারাগড (Smaragd) আকরিক বিশ্লেষণ করে এতে কিছু নতুন মাটির সন্ধান পেলেন। এই মাটি দেখতে অনেকটা চীনামাটির মতো ছিল। এই মাটিকে বেরিল মাটি নামকরণ করা হলো। আর ধাতুকে, তার লবণ মিষ্টি বলে প্রথমে গ্লিসিনিয়াম নামকরণ করা হলো। পরবর্তীতে ক্লাপ্রথ (Klaproth) দেখালেন যে ইট্‌রিয়ামের লবণের একই রকম মিষ্টি স্বাদ এবং প্রস্তাব দিলেন এই মৌলের আকরিক বেরিলের নামানুসারে বেরিলিয়াম রাখার জন্য। এরপর তা বেরিলিয়াম (Beryllium) নামেই পরিচিত হয়েছে। এই বেরিলিয়ামের সর্বব্যাপী আকরিক হলো বেরিল। ব্রাজিল, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, যুক্তরাজ্য, স্পেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নে এই বেরিলের প্রসিদ্ধ খনি আছে। তাছাড়া ইউক্লেজ (Euclase), গ্যাডোলিনাইট (Gadolinite), ক্রিসোবেরিল (Crysoberyl) ও ফেনাসাইট (Phenacite) আকরিকে কিছু বেরিলিয়াম থাকে। ভূত্বকে 8×10^{-8}% বেরিলিয়াম আছে। সাগরে এক লিটার পানিতে 5×10^{-10} গ্রাম বেরিলিয়াম থাকে। বেরিলিয়ামের গলনাঙ্ক ১২৮৪ সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ২৯৭০° সে.।

আকরিক অবস্থা থেকে পরিশোধন করতে অনেক খরচ পড়ে বলে এর ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্কর ধাতুসমূহ উড়োজাহাজে ও রকেটে ব্যবহার করা হয়। এই ধাতু এবং এর যৌগ অত্যন্ত বিষাক্ত। এর ধূলা শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণের ফলে বেরিলিওসস নামক কঠিন রোগ হয়।

সোডিয়াম (Na), Z=১১

প্রাচীনকাল থেকেই সোডিয়ামের যৌগ মানবজাতির কাছে পরিচিত। এর রাসায়নিক সঙ্কেত Na natrium শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। আর প্রাচীন ইহুদি ভাষার শব্দ neter থেকে natrium-এর উৎপত্তি। এর ইংরেজি নাম Sodium শব্দের মূল হলো ল্যাটিন শব্দ solida। মধ্যযুগে সকল ক্ষার ধাতুর লবণকে solida বলা হতো। ১৮০৭ সালে বিজ্ঞানী ডেবী (Davy) প্রথম বিশুদ্ধ অবস্থায় সোডিয়াম পেয়েছিলেন। তিনি আর্দ্র সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে প্লাটিনামের বাটিতে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করে সোডিয়ামকে আলাদা করতে সক্ষম হন।

banglainternet.com

প্রকৃতিতে সোডিয়াম মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অনেক দেশেই একে যৌগ অবস্থায় পাওয়া যায়। সোডিয়ামের বহুল প্রচলিত আকরিক হলো অলিগোক্লেজ (Oligolease) ও অ্যালবাইট (Albite)। এর যৌগ সোডিয়াম ক্লোরাইড পাথুরে লবণ হিসেবে অনেক খনিতে পাওয়া যায়। বিশাল হ্রদ কিংবা সমুদ্রের কিছু অংশ শুকিয়ে স্তরে স্তরে জমে আস্তে আস্তে এই পাথুরে লবণের কঠিন স্তর সৃষ্টি করে। সমুদ্রের পানিতে এই সোডিয়াম ক্লোরাইড (খাবার লবণ) দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং এর পরিমাণ প্রায় ১২%। এর নাইট্রেট যৌগ সল্ট পিটার (Salt petre) হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি ও পেরুতে, কার্বনেটকে ন্যাট্রোন (Natron) হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে ও আফ্রিকায় আর ট্রোনা (Trona) হিসেবে মিশরে এবং সাজিমাটি হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশে পাওয়া যায়। ভূত্বকে সোডিয়ামের পরিমাণ ২.৪% ও উল্কাপিণ্ডে ০.৭৮%।

এটি রুপালি সাদা রঙের নরম ধাতু। একে ছুরি দিয়ে কাটা যায়। এই ধাতু আর্দ্র বাতাসে খুব তাড়াতাড়ি জারিত হয় বলে একে সাধারণত পেট্রোলিয়ামের নিচে রাখা হয়। এর গলনাঙ্ক ৯৭.৫° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৮৮০° সে.।

অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম নিষ্কাশনে সোডিয়াম ব্যবহার করা হয়। সোডিয়াম পটাশিয়ামের সঙ্কর ধাতু থার্মোমিটারে উচ্চ তাপমাত্রা নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। সোডিয়াম বাষ্পবাতি, কৃত্রিম রবার তৈরিতে ও হিমায়ক হিসেবে পারমাণবিক চুল্লিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যাগনেসিয়াম (Mg), Z=১২

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলন্ডে খনিজ পানি থেকে এপসিম লবণ (ম্যাগনেসিয়াম সালফেট) নিষ্কাশন করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড পরিচিত ছিল। ১৮২৯ সালে বিজ্ঞানী বুসী সর্বপ্রথম এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন এবং ম্যাগনিয়াম (Magnium) নামকরণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রীক দেশে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট পাওয়া যেত। তখন এটি ম্যাগনেসিয়া আলবা নামে পরিচিত ছিল। এই ম্যাগনেসিয়া আলবা থেকেই পরে মূল ধাতুটিকে ম্যাগনেশিয়াম (Magnesium) নামকরণ করা হয়।

banglainternet.com

প্রকৃতিতে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এর প্রধান আকরিকগুলি হলো : কার্বনেট হিসেবে ম্যাগনেটাইট (Magnatite), ডলোমাইট (Dolomite) ; সালফেট হিসেবে ক্যাইনাইট (Kainite), কাইসেরাইট (Kieserite), এপসোমাইট (Epsomite), পলিহেলাইট (Polyhalite) ; ক্লোরাইড হিসেবে কার্নালাইট (Carnallite); সিলিকেট হিসেবে অলিভাইন (Olivine), অ্যাসবেস্টস (Asbestos), সোপস্টোন (Soapstone) ও সার্পেন্টাইন (Serpentine)। শিলামণ্ডলে ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ ২১%, ভূত্বকে ২.৩৫%. আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ~১.৬%.।

ম্যাগনেসিয়ামের গলনাঙ্ক ৬৫১° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ১১০৭° সে.। এটি তিনটি আইসোটোপের মিশ্রণ। এ ছাড়াও পাঁচটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে।

ম্যাগনেসিয়াম সক্রিয় ধাতু। একে কখনও কখনও মূৎক্ষার ধাতুসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বায়ু বা অক্সিজেনের সান্নিধ্যে একে তাপ দিলে উজ্জ্বল শিখাসহ জ্বলে ওঠে এবং জারিত হয়ে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে পরিণত হয়। এটি সাঙ্কেতিক আলোক উৎপাদনে ও আতশবাজি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। ওষুধপত্রে, ফটোগ্রাফীর আলোক উৎপাদনে এবং রেডিও ভ্যাকুয়াম টিউবেও এর ব্যবহার হয়। ডিউর‍্যালামিন (Duralamin), ম্যাগনালিয়াম (Magnalium) প্রভৃতি ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্কর ধাতু। থার্মাইট প্রক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়ামের একটি পাত ফিউজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের সাথে এর সঙ্কর ধাতু হাল্কা শক্ত জিনিস হিসেবে এরোপ্লেনে ব্যবহার করা হয়।

এর বিভিন্ন যৌগ ওষুধে, টুথপেস্টে, দন্ত-চিকিৎসায়, সুতার কারখানায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।

banglainternet.com

অ্যালুমিনিয়াম (Al), Z=১৩

অ্যালুমেন (alumen) থেকে অ্যালুমিনিয়াম শব্দের উৎপত্তি। সপ্তম শতাব্দীতে অ্যালুমেন (ফটকিরি) রঞ্জক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তখনকার এই ফটকিরি ছিল হিরাকস (green vitriol) অর্থাৎ ফেরাস সালফেট ও কিউপরিক সালফেটের মিশ্রণ। সম্ভবত আলকেমিস্টরাই সর্বপ্রথম প্রকৃত ফটকিরি পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানী মারগ্রাফ ১৭৫৬ সালে সর্বপ্রথম ফটকিরির

মাটি থেকে মূল ধাতব অক্সাইডসমূহ আলাদা করেন। এই মাটিকেই পরবর্তীতে অ্যালুমিনা নামকরণ করা হয়। ১৮০৮—১৮১০ সালে বিজ্ঞানী ডেভি এই অ্যালুমিনা থেকে অ্যালুমিনিয়াম পৃথক করার জন্য অনেক গবেষণা করেন।

১৮২৫ সালে বিজ্ঞানী এরস্টেড তাঁর নিজের আবিষ্কৃত অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডকে পারদসঙ্কর মিশ্রিত পটাসিয়াম দ্বারা বিজারিত করে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু পান। ১৮২৭ সালে বিজ্ঞানী বোলার বিজারক হিসেবে শুধু বিশুদ্ধ পটাসিয়ামকে ব্যবহার করে এই পদ্ধতিটির উন্নতি সাধন করেন। বোলারই সর্বপ্রথম এই ধাতুটির বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করেন। এরস্টেড যে ধাতুটি পেয়েছিলেন তা যে বিশুদ্ধ ছিল এমন কোনো তর্কাতীত প্রমাণ তাঁর কাছে ছিল না। তাই সকলে বোলারকেই অ্যালুমিনিয়ামের আবিষ্কারক হিসেবে জানেন।

সকল ধাতুর মধ্যে প্রকৃতিতে অ্যালুমিনিয়ামই বেশি বিস্তৃত রয়েছে। মুক্ত অবস্থায় এই ধাতুটি কখনও পাওয়া যায় না। তবে যৌগ অবস্থায় এটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর প্রধান আকরিকগুলো হলো : কোরানডাম (Corundum), রুবী (Ruby), সেফায়ার (Sapphire), পান্না (Emerald), ডায়াসপোর (Diaspore), বক্সাইট (Bauxite), গিবসাইট (Gibbsite), ক্রাইওলাইট (Cryolite), ফেল্ডস্পার (Feldspar), অ্যামারী (Emary)। ভূত্বকের ৭.৪৫%, শিলামণ্ডলের ৮.৮%, ও উল্কাপিণ্ডের ১.৭৪% হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্ক ৬৫৯.৭° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২০৫৭° সে.।

অ্যালুমিনিয়াম উত্তম তাপ ও বিদ্যুৎ-পরিবাহক। বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে এর পৃষ্ঠদেশে এক প্রকার পাতলা অক্সাইডের আবরণ তৈরি হয় বলে এতে মরিচা পড়ে না।

বিমান কারখানায় ও খাদ্য শিল্পে অ্যালুমিনিয়াম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। ইস্পাত প্রস্তুতে এটি বিজারক হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা কোরানডাম এত শক্ত যে এর ছোট ছোট দানাকে ঘর্ষক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। লেজারে রুবী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চীনামাটির বাসন তৈরিতে অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেটের ব্যবহার প্রচুর। পানি বিশোধনে রঙ-বন্ধক হিসেবে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করা হয়।

banglainternet.com

পটাসিয়াম (K), Z=১৯

পটাসিয়াম আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই এর লবণ পরিচিত ছিল। কিছু উদ্ভিদের ছাই থেকে এই পটাসিয়ামের লবণগুলো প্রথম পাওয়া গিয়েছিল। এখান থেকেই এই পটাশ ও পটাসিয়ামের নামকরণ করা হয়। আরবী শব্দ qili (পটাস) থেকে পটাসিয়াম সংকেত 'k'-এর উৎপত্তি। তবে সর্বপ্রথম ১৮০৭ সালে বিজ্ঞানী ডেবী তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে পটাসিয়ামকে এর লবণ থেকে পৃথক করতে সমর্থ হন।

প্রকৃতিতে পটাসিয়াম সাধারণত সিলিকেট ও অ্যালুমোসিলিকেট, যেমন ফেলডস্পার (Feldspar) হিসেবে পাওয়া যায়। সমুদ্রের পানিতে পটাসিয়ামের হ্যালোজেন যৌগ প্রায় ০.২৬%, বিদ্যমান আছে। শিলামণ্ডলে ২.৬০%, ভূত্বকে ২.৩৫% ও উল্কাপিণ্ডে ০.২০% পটাসিয়ামের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রাকৃতিক পটাসিয়ামের তিনটি আইসোটপ আছে। কৃত্রিম উপায়ে এর সাতটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। পটাসিয়ামের গলনাঙ্ক ৬২.৩° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৭৬০° সে.।

সোডিয়ামের সঙ্গে পটাসিয়ামের সঙ্কর ধাতু নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরের হিমায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পটাসিয়ামের বিভিন্ন যৌগ : যেমন পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড সাবান তৈরিতে, পটাসিয়াম নাইট্রেট বারুদ এবং রঙ তৈরিতে, পটাসিয়াম সালফেট কাচ কারখানায় কোয়ার্জ তৈরিতে এবং মূল্যবান সার হিসেবে ও পটাসিয়াম কার্বনেট সাবান এবং কাচ কারখানায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্যালসিয়াম (Ca), Z= ২০ :

ক্যালসিয়াম আবিষ্কারের অনেক আগেই এর যৌগ মানুষ ব্যবহার করতো। যেমন গৃহনির্মাণের কাজে মার্বেল পাথর বা চুনা পাথরকে পুড়িয়ে কলিচুন (ক্যালসিয়াম অক্সাইড) তৈরি করা হতো। একই কাজে প্রাচীনকালে জিপসামও ব্যবহার করা হতো। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ডিয়াসকোরিডস এই ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে 'কুইকলাইম' (কলিচুন) নামকরণ করেন। এবং বর্তমানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড সবার কাছে এই নামেই পরিচিত। ১৮০৮ সালে বিজ্ঞানী ডেবী ও বেরজেলিয়াস সর্বপ্রথম এই কলিচুনের মূল ধাতু ক্যালসিয়াম আবিষ্কার করেন। Calx শব্দ থেকে এই ধাতুর সঙ্কেত নেয়া হয়েছে।

প্রকৃতিতে সবচেয়ে বিস্তৃত মৌলগুলির অন্যতম ক্যালসিয়াম। কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় খুব সক্রিয় বলে মুক্ত অবস্থায় এটি পাওয়া যায় না। তবে কার্বনেট হিসেবে ডোলামাইটে (Dolomite), চুনাপাথরে (Limastone) ও খড়িমাটিতে ক্যালসিয়াম উপস্থিত থাকে। সালফেট হিসেবে সিলেনাইট (Selenite) আকরিক উল্লেখযোগ্য। এই ধাতুটির ছয়টি স্থায়ী ও আটটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আছে। ক্যালসিয়ামের গলনাঙ্ক ৮৪২—৮৪৮° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ১২৪০° সে.।

বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম রুপালি-সাদা রঙের ধাতু। এর ব্যবহারের ক্ষেত্র বেশ বিস্তৃত। গৃহনির্মাণ কাজে এই ধাতুর যৌগ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যন্ত্রপাতি তৈরিতে ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন হ্যালোজেন ও নাইট্রেট যৌগ ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক বাতিতে বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম ধাতুর ব্যবহার লক্ষণীয়। সীসার সাথে ক্যালসিয়ামের সংকর ধাতু রেলপথের ব্যারিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক শিল্পকারখানায়, বিশেষ করে অ্যাসিটাইলিন প্রস্তুতে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ব্যবহার অতুলনীয়। চিনি প্রস্তুতে ক্যালসিয়ামের লবণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুপার ফসফেট সারের মূল উপাদান হলো ক্যালসিয়াম।

ক্যালসিয়াম অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের মূল্যবান উপাদান। শক্ত অস্থি ও দন্ত গঠনে অপরিহার্য। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া এবং রক্তের জমাট বাঁধা নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

স্ক্যানডিয়াম (Sc), Z=২১

পর্যায় সারণীতে মৌলের ধর্মের পর্যাবৃত্তের ভিত্তিতে মেনডেলিভ এই ধাতুটির অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধে ১৮৭১ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এই অজানা মৌলটির গুণাবলী বোরন ও অ্যালুমিনিয়ামের মতো হবে বলে ঘোষণা করে তিনি এর 'একাবোরন' নামকরণ করেন। আট বছর পর ১৮৭৯ সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী নেলসন স্ক্যানডিনেভিয়ার গ্যাডোলিনাইট (Gadolinite) আকরিকে এক নতুন মৌলের সন্ধান পেলেন এবং প্রাপ্তি-স্থানের নামানুসারে এর নামকরণ স্ক্যানডিয়াম করলেন। এর গুণাবলী পুরোপুরিভাবে মেনডেলিভের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর একাবোরনের গুণাবলীর মতোই ছিল।

স্ক্যানডিয়াম দুর্লভ মাটির (rare-earth) ধাতু। প্রকৃতিতে উক্ত ধাতুটি দুর্লভ মাটির অন্য ধাতুগুলির সঙ্গেই পাওয়া যায়। এর প্রধান আকরিক হলো গ্যাডোলিনাইট যা প্রধানত স্ক্যানডিনেভিয়া উপদ্বীপে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু কিছু অঞ্চলে এই দুর্লভ মাটির সন্ধান মেলে।

শিলামণ্ডলে ও ভূত্বকে এর পরিমাণ খুবই কম এবং মাত্র ৬×১০$^{-৪}$%। এই মৌলটির দশটি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। স্ক্যানডিয়ামের গলনাঙ্ক ১০৫০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২৭৫০০° সে.।

এই ধাতুর ব্যবহারের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষেত্র নেই, তবে এ নিয়ে গবেষণা চলছে। ভবিষ্যতে হয়তো ধাতুটির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে।

টিটানিয়াম (Ti), Z=২২

প্রথমে টিটানিয়াম-এর ডাই অক্সাইড হিসেবে আবিষ্কৃত হয়। ১৭৮৯ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী গ্রেগোর মেনাকসেনাইট (Menaccanite) আকরিকে অজানা পদার্থের অক্সাইডের সন্ধান পেলেন। প্রথমে একে মেনাখিন নামকরণ করা হয়। ১৭৯৫ সালে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিজ্ঞানী ক্লাপ্রথ দেখালেন যে আকরিক রুটাইল (Rutile) একটি অজানা ধাতুর অক্সাইড ছাড়া কিছুই নয়। তিনি এই নতুন ধাতুটিকে টিটানিয়াম নামকরণ করলেন। এর অল্পকিছু কাল পরেই জানা গেল বিজ্ঞানী গ্রেগর আকরিক মেনাকসেনাইটে এক নতুন ধাতু আবিষ্কার করেছেন যা ক্লাপ্রথের আবিষ্কৃত টিটানিয়াম ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৮২২ সালে বিজ্ঞানী বোলেস্টন ব্লাস্ট ফার্নেসে (Blast furnace) টিটানিয়ামের একটা যৌগ সনাক্ত করে ভুলবশত বিশুদ্ধ টিটানিয়াম বলে ঘোষণা করলেন। আসলে এটি ছিল টিটানিয়ামের কার্বন ও নাইট্রোজেন ধারণকৃত যৌগ। এই ভুল ধারণাটিই অনেক দিন টিকে ছিল। যদিও ১৮২৫ সালে বেরজেলিয়াসের পক্ষে পটাসিয়াম ও টিটানিয়ামের ডাবল ফ্লোরাইড সোডিয়াম দ্বারা জারিত করে সত্যিকারে টিটানিয়াম ধাতু (পুরাপুরি বিশুদ্ধ নয়) পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। বেরজেলিয়াসের পক্ষে এটা অনুধাবন করতে মোটেই কষ্ট হলো না যে বোলেস্টনের ব্লাস্ট ফার্নেসের টিটানিয়াম সত্যিকারে টিটানিয়ামের একটি স্ফটিক ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং তিনি তার আবিষ্কৃত ধাতুটিকে অকেলাস

(Amorphous) টিটানিয়াম নামকরণ করলেন। অবশ্য ১৮৪৯ সালে বিজ্ঞানী বোলার প্রমাণ করেন যে ব্লাস্ট ফার্নেসের টিটানিয়াম স্ফটিকের উপাদানে স্বয়ং টিটানিয়াম ছাড়াও কার্বন এবং নাইট্রোজেন উপস্থিত ছিল। যথেষ্ট বিশুদ্ধ অবস্থায় সর্বপ্রথমে বিজ্ঞানী খুনতের ১৯১০ সালে টিটানিয়ামে লবণ থেকে মূল ধাতুটিকে পৃথক করেন।

টিটানিয়ামের প্রধান আকরিক হলো রুটাইল (Rutile) ও ইলমেনাইট (ilmenite)। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে এই টিটানিয়ামের উপস্থিতি লক্ষণীয়। শিলামণ্ডলে ও ভূত্বকে এই মৌলিক ধাতুটির পরিমাণ ০.৬%, আর পাথুরে উল্কা পিণ্ডে ০.০৯%। প্রাকৃতিক টিটানিয়াম হলো পাঁচটি আইসোটোপের মিশ্রণ। এর গলনাঙ্ক ১৬৬৮° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩২৬২° সে.।

টিটানিয়ামের কয়েকটি ধর্মের জন্য এর ব্যবহারও ব্যাপক। যেমন ঘনত্ব কম বলে উড়োজাহাজ এবং রকেটে, সমুদ্রের পানিতে মরিচা পড়ে না বলে জাহাজ নির্মাণে এর ব্যবহার করা হয়। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য (Radioactive waste) সংরক্ষণের জন্য টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রেটের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

ভ্যানাডিয়াম (V), Z=২৩

১৮৩০ সালে বিজ্ঞানী সেফস্ট্রম (Sefstrom) সুইডেনের টাবের্গ অঞ্চলের পেটা লোহা থেকে একটি নতুন মৌল আবিষ্কার করেন। প্রাচীন স্ক্যানডিনেভিয়ানদের সৌন্দর্য দেবতা ভ্যানাসিসের নামানুসারে উক্ত মৌলটিকে ভ্যানাডিয়াম (Vanadium) নামকরণ করেন। অবশ্য এরও ২৯ বছর আগে মেক্সিকোর সিমাপানে খনিজবিদ্যাবিদ্ ডেল রিও সীসার আকরিক থেকে ভ্যানাডিয়াম পেয়েছিলেন। এর অক্সাইডে বিভিন্ন রঙের জন্য প্রথমে প্যানক্রোম ও পরে এর উত্তপ্ত লবণের লাল রঙের জন্য এরিথ্রোন (Erythron) নামকরণ করা হয়। কিন্তু ডেল রিও তখন যথাযথ প্রমাণ করতে পারেন নি যে আসলে এটি ছিল একটি নতুন ধাতুর যৌগ। তাছাড়া পরবর্তীকালে তিনি নিজেই এই লবণকে ক্রোমিয়াম ধাতুর বিভিন্ন রূপ বলে বর্ণনা করেছিলেন। আসলে সিমাপানের ঐ আকরিক ছিল ভ্যানাডিয়ামের যৌগ। বিজ্ঞানী বোলার সেফস্ট্রমের ভ্যানাডিয়াম আবিষ্কারের পর এটি প্রমাণ করে তার নাম দিলেন ভ্যানাডিনাইট (vanadinite)।

ভূত্বকে ভ্যানাডিয়ামের ব্যাপক উপস্থিতি সত্ত্বেও খুব কম সময়ই এটি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রায় দীর্ঘকাল ধরেই প্রধান উৎস হিসেবে ছিল পেরুর প্যাট্রোনাইট (Patronite) আকরিক। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় ও উত্তর আমেরিকায় বেশ কিছু ভ্যানাডিয়ামের আকরিক পাওয়া যায়। এই ধাতুটির প্রথম আবিষ্কৃত আকরিক ভ্যানাডিনাইট প্রধানত মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশে এবং স্পেনে ছড়িয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রে ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে আকরিক কারনোটাইট (Carnotite) পাওয়া যায়। ভূত্বকে ও উল্কাপিণ্ডে ভ্যানাডিয়ামের পরিমাণ যথাক্রমে ০.০২% ও ৯×১০$^{-৩}$%। প্রাকৃতিক ভ্যানাডিয়ামের দুইটি আইসোটোপ দেখা যায়। এ ছাড়াও কৃত্রিম সাতটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। ভ্যানাডিয়াম খুব কঠিন ধাতু। এর গলনাঙ্ক ১৭১০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩০০০° সে.।

বিশুদ্ধ ভ্যানাডিয়াম ও তার যৌগসমূহ খুব ভালো অনুঘটক। ফলে পরীক্ষাগারে এবং শিল্পক্ষেত্রে সালফিউরিক এসিড, এসিটিক এসিড, অ্যানাইলিন ব্ল্যাক (aniline black) ও কালি তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। মৃৎশিল্পের ও কাচের রঞ্জনে এটি বিদ্যমান থাকে।

ক্রোমিয়াম (Cr), Z=২৪

১৭৯৭ সালে বিজ্ঞানী ভকেলিন (Vauquelin) সাইবেরিয়ার এক ধরনের আকরিক ক্রোমিয়াম আবিষ্কার করেন আর ১৮৫৪ সালে বিজ্ঞানী বুনসেন একে পৃথক করতে সমর্থ হন। সুন্দর রঙ হলো এই মৌলটির বিভিন্ন লবণ ও আকরিকের বৈশিষ্ট্য। তাই Chroma অর্থাৎ রঙ, এই শব্দ থেকেই ক্রোমিয়াম নামকরণ করা হয়।

ক্রোমিয়ামের প্রধান আকরিক হলো ক্রোমাইট (Chromite)। এটি লৌহ এবং ক্রোমিয়াম ডাই-অক্সাইডের যৌগ। উরালে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, গ্রীসে, মাদ্রয়েশিয়ায়, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উপদ্বীপে, হাঙ্গেরীয়ায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সীসার খনিতে, বিশেষ করে ব্রাজিলে এবং উরালে কিছু পরিমাণ ক্রোমিয়ামের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

প্রায়ই অ্যালুমিনিয়ামের আকরিকে এর বিকল্প হিসেবে ক্রোমিয়াম ধাতু উপস্থিত থাকে। যেমন পিকোটাইট (Picotite), ক্রোম মাইকা (Chrome

Mica), ক্রোমগার্নেট (Chrome Garnet), ক্রোম টুরমালাইন (Chrome Tourmaline) আকরিকগুলি এই শ্রেণীর আওতাভুক্ত।

মোটের উপর শিলামণ্ডল এবং ভূত্বক ০.০৩%, ও উল্কাপিণ্ড ০.২৪%, ক্রোমিয়াম ধারণ করে। ক্রোমিয়ামের চারটি আইসোটোপ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এছাড়াও তেজস্ক্রিয় ছয়টি আইসোটোপ রয়েছে। ক্রোমিয়ামের গলনাঙ্ক ১৮৯০° সে. এবং স্ফুটনাঙ্ক ২৪৮০° সে.। বায়ুতে ক্রোমিয়াম ধাতু খুব স্থায়ী। সহজে মরিচা ধরে না বলে বহু ধাতু ও সংকর ধাতুর পৃষ্ঠদেশে ইলেকট্রোলাইটিক পদ্ধতিতে এর পাতলা আবরণ বসান হয়। উজ্জ্বল এবং চকচকে সংকর ধাতুতে ক্রোমিয়াম থাকে। তড়িৎদ্বার এবং থার্মোকাপলে এটি ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষাগারে রাসায়নিক বিশ্লেষণে, রঞ্জক ও মৃৎ-শিল্পে ক্রোমিয়ামের লবণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যাঙ্গানিজ (Mn), Z=২৫

প্রাচীনকাল থেকেই ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড পিরোলিউসাইট (Pyrolusite) পরিচিত ছিল। তখন একে ম্যাগনেটাইটের রূপান্তর ম্যাগনেস (Magnes) রূপে গণ্য করা হতো। খয়েরি রঙের ম্যাগনেটাইটের স্থলে প্লিনী কাল অচুম্বকীয় পিরোলিউসাইটকে 'স্ত্রী-চুম্বক' বলা হতো। অবশ্য মধ্য যুগেই ম্যাগনেটাইট অথবা ম্যাগনেস ও ম্যাগনেশিয়া (Magnasia) অথবা নকল চুম্বক—পিরোলিউসাইটের পার্থক্য মানুষের বোধগম্য হলো। মৃত্তিকা নির্মিত পাত্রে এই নকল চুম্বকটি (স্ত্রী-চুম্বক) কালো ধূসর রঙের আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খয়েরি রঙের ঔজ্জ্বল্য দিত বলে আলকেমিস্ট ভালেন্টিন এর নাম দিলেন পিরোলিউসাইট (Praunstein)। কাচে পিরোলিউসাইট উপস্থিত থাকলে কাচকে বিবর্ণ করে বলে কাচ কারিগররা নাম দিলেন 'কাচের সাবান' (Blassefe) এবং পুরানো নাম ম্যাগনেস-এর পরিবর্তে ম্যাঙ্গানিজ (Manganes) নব-নামকরণ করলেন।

banglainternet.com

প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পিরোলিউথাইটকে লোহার আকরিক হিসেবেই গণ্য করা হতো। এই আকরিক যে লোহার নয় বরঞ্চ অন্য কোনো অজ্ঞাত ধাতুর হবে ধারণার সঠিক প্রমাণ দিলেন বিজ্ঞানী শীলে ১৭৭৪ সালে। সুইডিস রসায়নবিদ্ হ্যান ঐ একই বছর পিরোলিউযাইট ও কার্বনের মিশ্রণকে ভস্মীকরণের ফলে বোতাম পরিমাণ এই ধাতুটি (Braunstein

metal) পান এবং ম্যাঙ্গনেসিয়াম (Maanesium) নামকরণ করেন। তাই এখনও অনেক দেশে Manganese নামই প্রচলিত। তৎকালীন আবিষ্কৃত মৌল ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে পরবর্তীতে যাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না-করে এই মর্মে ল্যাটিন নাম ম্যাঙ্গানিয়াম (Manganium) নব-নামকরণ করা হয়।

প্রকৃতিতে লোহার পরে ভারি ধাতুগুলির মধ্যে ম্যাঙ্গানিজই সব চেয়ে বেশি ছড়িয়ে আছে। কম-বেশি প্রায় সব জায়গায়ই এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রধান আকরিকগুলির মধ্যে পিরোলিউযাইট উল্লেখযোগ্য। জার্মানীতে, সোভিয়েত ইউনিয়নে, ঘানায়, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ও চিলিতে এই আকরিকটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য আকরিকগুলির মধ্যে ব্রাউনাইট (Braunite), ম্যাঙ্গানাইট (Mauganite) হাউসম্যানাইট) (Hausmanite) উল্লেখযোগ্য। পর্যায় সারণীতে এর পার্শ্ববর্তী ধাতু লোহার প্রায় সব আকরিকে কমবেশি ম্যাঙ্গানিজ থাকে। তবে ধূসর-বাদামী রঙের ম্যাগনেটাইটে ও সাইডেরাইটে (Siderite) এর পরিমাণ বেশি। মাঙ্গানিজে সমৃদ্ধ এমন লোহার আকরিকই জার্মানীতে এই ধাতুটির প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য।

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে অল্প কিছু ম্যাঙ্গানিজ থাকে। এদের কোষে সংঘটিত সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে অনুঘটক হিসেবে ত্বরান্বিত করাই এর কাজ। ভূত্বকে ও শিলামণ্ডলে এর পরিমাণ ০.১%, আর লৌহ উল্কাপিণ্ডে ০.৩০%। ম্যাঙ্গানিজের গলনাঙ্ক ১২৬০° সে., আর স্ফুটনাঙ্ক ১৯০০° সে.।

ম্যাঙ্গানিজ দেখতে অনেকটা লোহার মতো। তবে লোহার তুলনায় এটি কঠিন এবং ভঙ্গুর। বিশেষ করে লোহা এবং ইস্পাত বিজারিত করার লক্ষ্যে এই ধাতুটি ব্যবহার করা হয়। কাচ শিল্পে বিবর্ণকারক হিসেবে, কাচে বেগুনি রঙ করার জন্যে, মাটির হাঁড়ি-বাসনে খয়েরি রঙের ঔজ্জ্বল্য তৈরিতে পিরোলিউযাইটের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট উত্তম জারক, জীবাণুনাশক ওষুধ ও বিরঞ্জক। ম্যাঙ্গানিজের ক্লোরাইড, সালফেট ও অন্যান্য লবণ রঙ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

banglainternet.com

লৌহ (Fe), Z=২৬

ব্যাপকভাবে কখন প্রথম লোহা নিষ্কাশন শুরু হয় সঠিকভাবে এখনও জানা যায় নি। খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগের উল্কাপিণ্ডের লোহার তৈরি হার

পাওয়া গেছে মিশরে। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগের উল্কাপিণ্ডের লোহার তৈরি ছোরা পাওয়া গেছে। এর হাতল ছিল স্বর্ণের। উল্কাপিণ্ডের লোহাকে সহজেই চেনা যায়। কেননা এতে গড়ে ৮-১০%. নিকেল থাকে। ককেসাসের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশন হতো। তামার তুলনায় লোহার খনিগুলি ঘনঘন দেখা যেত। লোহার যেই খনির সন্নিকটে কাঠি থাকতো সেখানেই এই ধাতুটি নিষ্কাশিত হতো। প্রাগৈতিহাসিককালে লোহার আকরিক এবং কাঠ কয়লা প্রশস্ত কূপে জড় করে আগুন ধরিয়ে হাপরের সাহায্যে বায়ুপ্রবাহ দেয়া হতো। উৎপন্ন তাপে নরম লোহার পিণ্ড তৈরি হলে হাতুড়ি দিয়ে মসৃণ করা হতো। মধ্যযুগে এই কূপ ক্রমান্বয়ে চুল্লিতে রূপান্তরিত করা হয় আর পরবর্তীতে উন্নত হয়ে বাত্যা চুল্লির (blast furnace) রূপ নেয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রবল বায়ু প্রবাহের জন্য পানি শক্তিকে ব্যবহার করে চুল্লিতে ব্যবহৃত হাপরগুলি চালাতো। চুল্লির তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উন্নতমানের লোহা, কাঁচা লোহা (Cast iron, Pig iron) পাওয়া সম্ভব হয়। কাঁচা লোহাতে কার্বন (পরিমাণে বেশি), সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ ও সালফার থাকে। এই লোহা তত নমনীয় নয়। অল্পসময়েই মানুষ কাঁচা লোহাকে দ্বিতীয় বারের মতো উচ্চ গতিসম্পন্ন বায়ুপ্রবাহে বিগলিত করে পরিশোধনের ফলে অপেক্ষাকৃত নমনীয় করতে শেখে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাষ্পীয় ইঞ্জিন অধিকার ও রেললাইন নির্মাণ শুরু হলে এদের চাহিদা মেটাতে লোহার উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তখন কাঠ কয়লার পরিবর্তে জ্বালানি ও বিজারক হিসেবে কোক কয়লার ব্যবহার শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরিশোধন পদ্ধতির আরো উন্নতি করে বায়ুপ্রবাহে কনভার্টর ব্যবহার এবং পুনরুৎপাদী বিগলন শুরু করা হয়। পরবর্তীতে উন্নতমানের ইস্পাত উৎপাদনে লোহকে বিগলনের জন্য ইলেকট্রিক চুল্লির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

banglainternet.com

ধারণা করা হয় যে পৃথিবীর কেন্দ্র লৌহ ও নিকেলের তৈরি। অ্যালুমিনিয়ামের পরেই ভূত্বকে লোহার স্থান। প্রায় শত শত আকরিকে কম-বেশি লৌহ ছড়িয়ে আছে। অনেক আকরিক এর পরিমাণ প্রায় ৫০%. পর্যন্ত দেখা যায়। এর প্রধান আকরিকগুলি হলো : ম্যাগনেটাইট (Magnatite) রেড হেমাটাইট (Red hematite), লিমোনাইট (Limonite), সাইডেরাইট

(Siderite) ও পাইরাইট (Pyrite)। শিলামণ্ডলে লোহার পরিমাণ ৫.১০%। আর ভূত্বকে ৪.২০%, লৌহউল্কাপিণ্ডে লোহার পরিমাণ ৯০.৮%। আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ১৫%। প্রাকৃতিক লোহা চারটি স্থায়ী আইসোটোপের মিশ্রণ। এছাড়াও ছয়টি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কৃত্রিম উপায়ে পাওয়া গেছে। লোহার গলনাঙ্ক ১৫৩৫° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩৫০০° সে.।

বিশুদ্ধ লোহা সাদা এবং খুব নমনীয়। লোহাকে কার্বনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কাঁচা লোহা (২-৫%. কার্বন) পেটা লোহা (০.১২-০.২৫%. কার্বন) ও ইস্পাত (০.২৫-১.৫%. কার্বন)। ইস্পাতে ১২%. ক্রোমিয়াম মরিচা প্রতিরোধ করে। কাঁচা লোহা রেলিং তৈরিতে, পেটা লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুতিতে সাধারণত ব্যবহৃত হয়। পেটা লোহা তার, জাল, পিয়ানোর তার, তড়িৎ চুম্বক ইত্যাদির প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়। রেল লাইন, রেলের চাকা, জাহাজ, ক্রেইন, মেশিন গান ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র, ইঞ্জিন, ডাক্তারি যন্ত্রপাতি, ছুরি, কাঁচি, চুম্বক ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি প্রস্তুতে ইস্পাতের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। লোহা চুম্বকীয় পদার্থ। সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে লোহার এই চুম্বকত্ব ব্যবহার করা হয়। চুম্বকীয় লৌহ অক্সাইড কম্পিউটার টেপ-রেকর্ডারের টেপ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কোবাল্ট (Co), Z=২৭

আগের দিনে খনিতে যে-সব আকরিকসমূহের বাহ্যিক ধাতব বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও কোনো ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব হতো না তাদের কোবাল্ট বলা হতো। পরিহাসসূচক খনিজীবীরা এই আকরিকগুলিকে 'পাহাড়ের আত্মা' বলে সম্বোধন করতো। পরবর্তীতে অবশ্য যে-সব আকরিক থেকে কোনো ধাতু উৎপাদন সম্ভব হতো না বরং তারা কাচকে নীল রঙ রঙিন করতো কেবল ঐ শ্রেণীর আকরিককেই কোবাল্ট বলা হতো। ১৭৩৫ সালে সুইডিস রসায়নবিদ্ ব্র্যাণ্ড সর্বপ্রথম খনিজীবীদের 'পাহাড়ের আত্মার' অজ্ঞাত ধাতুটিকে আবিষ্কার করেন। এবং বর্তমানে এটিই কোবাল্ট (Cobalt) নামে পরিচিত।

প্রকৃতিতে কোবাল্টকে সব সময় নিকেলের সাথে এবং অনেক সময় আর্সেনিকের যৌগ হিসেবে পাওয়া যায়। এর প্রধান আকরিক হলো স্মালটাইট (Smaltite) ও কোবাল্টাইট (Cobaltite)। কানাডায়

অ্যাসবোলান (Asbolan) আকরিকেও প্রচুর পরিমাণ কোবাল্ট থাকে। এটি বিশুদ্ধ অবস্থায় অনেক সময় উল্কাপিণ্ডের লোহাতে ০·৫—২·৫%. পাওয়া যায়। ভূত্বকে কোবাল্টের পরিমাণ ২×১০^{-৩} %.। এ পর্যন্ত দশটি তেজস্ক্রিয় আইসোটপ পাওয়া গেছে। কোবাল্টের গলনাঙ্ক ১৪৯৫° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২৯০০° সে.।

পূর্বে পটাসিয়াম সিলিকেটের সাথে কোবাল্টের ডাবল-সল্ট ব্যবহার করা হতো (কোবাল্ট কাচ)। এটি নীল রঙের স্ম্যাল্ট (Smalt) নামে পরিচিত। গলিত কাচে এবং মৃৎশিল্পে রঙের কাজে এটি ব্যবহার করা হয়। ধাতব কোবাল্টের ব্যবহার কেবল গেল কয়েক বছর ধরে ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। বর্তমানে এর প্রধান অংশ সংকর ধাতু ও দ্রুতকর্তন সন্তব এমন কিছু ইস্পাত তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নিকেল (Ni), Z=২৮

বিজ্ঞানী ক্রনস্টেড ১৭৫১ সালে নিকেল আবিষ্কার করেন। জার্মান শব্দ Kupfernickel (অযোগ্য তামা) থেকে এই নিকেল (Nickel) শব্দের উৎপত্তি। তৎকালীন খনি-শ্রমিকদের ভাষায় 'নিকেল' ছিল একটি গালাগালি। 'কুপফের নিকেল' দেখতে বাহ্যিক দিক দিয়ে তামার আকরিকের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। অথচ কোনো মতেই এই আকরিকটি থেকে তামা উৎপাদন সম্ভব হয় নি। শুধু কি তাই, নিকেল আবিষ্কারের পরেও বহুদিন পর্যন্ত কিছু সংখ্যক রসায়নবিদ্ একে তামার আকরিক বলেই গ্রহণ করতো। অবশ্য ১৭৭৫ সালে বিজ্ঞানী বের্গম্যান সঠিকভাবে নিকেলের প্রস্তুত প্রণালী, ধর্মাবলী ও লৌহের সঙ্গে সাদৃশ্য বর্ণনা করলে এই কতিপয় রসায়নবিদ্দের ভুল ধারণার অবসান ঘটে।

banglainternet.com

প্রাকৃতিক অবস্থায় নিকেলকে সাধারণত সালফার, আর্সেনিক ও এন্টিমনির সাথে যৌগরূপে দেখা যায়। যেমন সালফারের সাথে এর আকরিক মিল্লেরাইট (Millerite), আর্সেনিকের সাথের আকরিক কপার নিকেল (Copper Nickel), আর এন্টিমনির সাথের আকরিক ব্রেইটহপ্টাইট (Breithauptite) উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়াও ক্লোয়ানথাইট (Chloanthite), গেরসডরফাইট (Gersdorffite) ও আল্‌ম্যান্নাইট (Ullmannite) আকরিকসমূহ দেখা যায়।

উল্লিখিত আকরিকসমূহ ব্যতীত নিকেল নিষ্কাশনের জন্য গ্যারনিয়েরাইট আকরিককে প্রাধান্য দেয়া যায়। এতে গড়ে প্রায় ৩%. নিকেল উপস্থিত থাকে। তা ছাড়াও প্রায়ই উল্কাপিণ্ডে লোহার সাথে প্রাকৃতিক সংকর ধাতু লক্ষণীয়। শিলামণ্ডলে ২০১০$^{-৩}$%., ভূত্বকে ০.০২%. ও উল্কাপিণ্ডের লোহায় ৮.৬%. নিকেল আছে। নিকেলের পাঁচটি স্থায়ী ও সাতটি তেজস্ক্রিয় আইসোটপ আছে। এর গলনাঙ্ক ১৪৫৫° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩০৭৫° সে.।

অনেক আগে থেকেই মুদ্রা তৈরিতে নিকেলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আর্জেণ্টান (Argentan) সংকর ধাতু (১০—২০%. নিকেল) বিভিন্ন গৃহস্থালী জিনিসপত্র প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বিশুদ্ধ নিকেলের তৈরি অনেক যন্ত্রপাতি পরীক্ষাগারের প্রয়োজন মিটায়। লোহার তৈরি জিনিসপত্রকে নিকেলের প্রলেপ দিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা এবং মরিচা প্রতিরোধ করা হয়। নিকেল (৬৮%.), তামা (৩০%.) ও লোহার (২%.) সংকর ধাতু রাসায়নিক প্রভাবে নিস্ক্রিয়।

কপার (Cu), Z=২৯

ধাতুর মধ্যে স্বর্ণের পরেই কপারের (তামা) ব্যবহার শুরু হয়। মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যেত বলেই সম্ভবত প্রাচীনকালে সকল বস্তু তৈরিতে তামা ব্যবহৃত হতো। সঠিক কখন তামার পরিশোধন শুরু হয়েছে আমাদের অজানা। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা অবশ্য খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগের ছাঁচে ঢেলে তৈরি কপারের কুঠার খুঁজে পেয়েছেন। ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে তখন মানুষের জ্ঞান এত কম ছিল যে এই কুঠারের ঢালাই কৌশল সম্বন্ধে কিছু বলা মুশকিল। প্রায় অর্ধ মিটার ব্যাসের কপারের ডেকচি পাওয়া গিয়েছিল এক ফেরাউনের (খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯৫—২৬৬৫ অব্দ) সমাধি-মন্দিরে। এটি তখনকার কারিগরদের ধাতু প্রসেসিং করার নিপুণতারই প্রমাণ রাখে।

সাইপ্রান (Cypern) দ্বীপে কপারের আকরিককে প্রথমে Oes Cyprium, পরে Oes Cuprium এবং সর্বশেষে Cupram বলা হতো। এই শেষের শব্দটি থেকেই কপারের বর্তমান লেটিন নামের উৎপত্তি।

কপারকে যৌগরূপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে মৌলিক অবস্থায় বিপুলাকারে খুব কম সময়ই একে দেখা যায়। যেমন উত্তর আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদে, সাইবেরিয়ার ইউরাল পর্বতে, সুইডেনে ও আসামে

সামান্য পরিমাণ মৌলিক কপার পাওয়া যায়। যৌগ হিসেবে এর প্রধান আকরিক হলো কিউপ্রাইট (Cuprite) ও চ্যালকোপিরাইট (Chalco-Pyrite)। ভূত্বকে ও শিলামণ্ডলে ০·০১%. কপার আছে আর উল্কাপিণ্ডের লৌহে এর পরিমাণ ০·০১২%.। জীবদেহে, বিশেষ করে হাড় এবং দাঁতে স্বল্প পরিমাণ কপার উপস্থিত থাকে। যেমন দাঁতে এর পরিমাণ ০·০০৬%.। কপারের দুটি স্থায়ী ও দশটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর গলনাঙ্ক ১০৮৩° সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ২৫৯৫° সে.।

লোহা এবং অ্যালুমিনিয়ামের পরেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কপারের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যদিও গেল কয়েক বছর ধরেই অনেক শাখায় অপর কোনো সস্তা ধাতু দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করা হচ্ছে, তথাপি সংকর ধাতু হিসেবে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরিতে এবং শিল্পকর্মে প্রচুর পরিমাণ কপার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কপারের বৈদ্যুতিক তার উত্তম বিদ্যুৎ-পরিবাহক। ব্রোঞ্জ-কপারের সংকর ধাতু আমাদের কাছে অতি পরিচিত।

জিংক (Zn), $Z=30$

অতি প্রাচীনকাল থেকেই জিংকের সংকর ধাতু পিতল পরিচিত। ভারতে প্রায় সপ্তম ও চীনে একাদশ শতাব্দীতে এই পিতলের ব্যবহার শুরু হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসিল ভেলেনতিক জিংকের নামোল্লেখ করেন। আকরিক থেকে নিষ্কাশনের জটিলতার জন্য তুলনামূলক অনেক পরেই ইউরোপে জিংক পরিচিত হয়। কেবল মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে বিশুদ্ধ জিংক নিষ্কাশিত হয়। বিজ্ঞানী ম্যারগ্রাফ সর্বপ্রথম ১৭৭৬ সালে ধাতব জিংক নিষ্কাশন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে জিংকের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে শুরু হয়। পূর্বে ভারত থেকে আমদানী করে ইউরোপের চাহিদা মিটাতো।

banglainternet.com

জিংকের প্রধান আকরিক হলো সালফাইডরূপে স্ফালেরাইট (Sphalerite), কার্বনেট-রূপে স্মিথসোনাইট (Smithsonite) এবং সিলিকেট-রূপে ক্যালামাইন (Calamine)। মানবদেহে এবং উদ্ভিদে জিংকের পরিমাণ যথাক্রমে ০·০০১%. ও $১০^{-৪}$%.। মানবদেহে বিশেষ করে দাঁতে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ০·০২%. পর্যন্ত হয়। ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে এর পরিমাণ হ্রাস পায়। ভূত্বকে জিংকের পরিমাণ ০·০২%. আর লৌহ

উল্কাপিণ্ডে ০·০১২%। জিংকের পাঁচটি স্থায়ী ও নয়টি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। এর গলনাঙ্ক ৪১৯·৫° সে., স্ফুটনাঙ্ক ৯০৭° সে.।

লৌহ ও ইস্পাতে দস্তা লেপনে (Galvanization) জিংকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। অতি প্রয়োজনীয় সংকর ধাতু যেমন পিতল এবং ড্রাইসেল তৈরিতে জিংক ব্যবহার করা হয়। জিংক ক্লোরাইড কাঠ সংরক্ষণে জলনিষ্কাশক (Drying agent) হিসেবে এবং ব্যাটারি তৈরিতে প্রয়োজন হয়। জিংক অক্সাইড অপরিবাহক এবং রঞ্জক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর জিংক পারঅক্সাইড উত্তম বীজাণু-মারক (Antiseptic)।

গ্যালিয়াম (Ga), Z=৩১

১৮৭৫ সালে ফরাসী রসায়নবিদ্ লেকোকে ডে বয়েসবদ্রান (Lecoq de Boisbaudran)। বিভিন্ন মৌলের বর্ণালী-বিষয়ক গবেষণা করতে গিয়ে পর্যায় সারণীর তৃতীয় গ্রুপের অ্যালুমিনিয়াম ও ইনডিয়াম মৌলের বর্ণালী রেখার অনিয়মানুবর্তিতা লক্ষ্য করলেন। সঠিক কারণ অনুধাবনের উদ্দেশ্যে শত শত খনিজদ্রব্যের নমুনার উপর পরীক্ষা চালিয়ে পিরেনিয়ের (Pyrenees) জিংকব্লেনড (Zincblend) নমুনায় সেই অনুপস্থিত বর্ণালী রেখাটি দেখতে পেলেন। একই বছর তিনি মৌলিক ধাতুটির কয়েক গ্রাম নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন। এবং মাতৃভূমি ফ্রান্সের সম্মানে (লেটিন Gallia—ফ্রান্স) গ্যালিয়াম নামকরণ করলেন।

গ্যালিয়াম খুব বিক্ষিপ্ত মৌল। এটি অল্প অল্প পরিমাণে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। বিশেষ কেরে বকসাইটে, দস্তা-ব্লেনডে ও কয়লায় গ্যালিয়াম পাওয়া যায়। এর মূল উৎস হলো অ্যালুমিনিয়ামের শিল্প প্রতিষ্ঠান। গ্যালিয়ামের পরিমাণ ভূত্বকে ১০$^{-৪}$%, লৌহ উল্কাপিণ্ডে ৫×১০$^{-৫}$%, ও পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ৫·১০$^{-৬}$%। এর দুটি স্থায়ী ও বারোটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। ২৯·৭৫—১৯৮৩° সে. তাপমাত্রায় ধাতুটি তরল থাকে।

গ্যালিয়ামের ব্যবহারও সীমিত। সহজে গলে যায় যেমন টিন, সীসা, বিসমাথ, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতির সংকর ধাতু তৈরিতে গ্যালিয়াম ব্যবহার করা হয়। এর বাষ্পপূর্ণ বাল্ব থেরাপিয়াতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রা মাপক থার্মোমিটারে এর ব্যবহার লক্ষণীয়।

banglainternet.com

জার্মেনিয়াম (Ge), Z=৩২

জন নিউল্যাণ্ড ১৮৬৪ সালে উল্লেখ করেন যে পর্যায় সারণীতে সিলিকন এবং টিনের মাঝে একটি মৌল অনুপস্থিত আছে। ১৮৭১ সালে মেনডেলিভ তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত পর্যায় সারণী ভিত্তিক ইকা-সিলিকন (বর্তমানে জার্মেনিয়াম) মৌলটির শুধু অস্তিত্বই নয় বরং বিভিন্ন ধর্মাবলীরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ১৮৮৫ সালে বিজ্ঞানী ক্লিমেনস উইংকলার (Clemens Winkler) আরগিরোডাইট (Argyrodite) খনিজদ্রব্য থেকে সর্বপ্রথম ইকা-সিলিকন মৌলটি পৃথক করে মেনডেলিভের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সততা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। তিনি মাতৃভূমি জার্মানীর নামানুসারে এই নতুন মৌলটির জার্মেনিয়াম (Germanium) নব-নামকরণ করেন।

নিষ্কাশনের জন্য এই ধাতুটির তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো আকরিক নেই। তবে অন্য কোনো ধাতু উৎপাদনে উপজাত (Byproduct) হিসেবে একে পাওয়া যায়। এই আকরিকগুলি হলো আরগিরোডাইট, ক্যানফিল্ডাইট (Canfieldite), জার্মেনাইট (Germanite), রেনিয়েনাইট (Renierite) ও আলট্রাবেসাইট (Utrabasite)। ভূত্বকে জার্মেনিয়ামের পরিমাণ 8×10^{-4}%. আর উল্কাপিণ্ডে প্রায় 10^{-3}%.। জার্মেনিয়ামের পাঁচটি স্থায়ী ও নয়টি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এর গলনাঙ্ক ৯৫৮·৫° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২৭০০° সে.।

জার্মেনিয়াম ধাতুটি অর্ধ-পরিবাহক। এর স্ফটিক দ্বারা বিদ্যুৎ পরিশোধন ও আলোকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা যায়। ধাতুটি ট্রানজিস্টারে, উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আলোকতাড়িত চক্ষুতে (photoelectric eyes) এবং সিলিকনের সঙ্গে অবলাল রশ্মির যন্ত্রের লেন্স-এ ডায়ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

banglainternet.com

রুবিডিয়াম (Rb), Z=৩৭

১৮৬১ সালে বিজ্ঞানী বুনসেন (Bunsen) ও কির্খহফ (Kirchhoff) বর্ণালী-বিষয়ক বিশ্লেষণ করে রুবিডিয়াম আবিষ্কার করেন। মৌলটির বর্ণালীর দুইটি বৈশিষ্ট্যমূলক রেখাভিত্তিক এর নাম দেয়া হয় রুবিডিয়াম (Rubidium)। ল্যাটিন ভাষায় Rubidus হলো গাঢ় লাল। বর্ণালীর লাল অংশে এই রেখাগুলির অবস্থান বলেই এই নামকরণ।

অনেক ক্ষেত্রেই অন্যান্য ক্ষার ধাতুর আকরিকের সাথে রুবিডিয়ামকে পাওয়া যায় এবং স্বল্প পরিমাণ অথচ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। তুলনামূলকভাবে লেপিডোলাইটে (Lepidolite) রুবিডিয়ামের পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকে (১%. এর বেশি)। কারনালাইট (Carnallite) আকরিকে এই মৌলিক ধাতুটির পরিমাণ ০·০১৫%. হয়। শিলামণ্ডলে ও ভূত্বকে রুবিডিয়ামের পরিমাণ যথাক্রমে ০·০৩%. ও ৮×১০$^{-৩}$ %.। এ পর্যন্ত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঠারটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। রুবিডিয়ামের গলনাঙ্ক ৩৮.৫° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৭০০° সে.।

তড়িৎকোষে রুবিডিয়ামের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সিজিয়াম ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই লক্ষ্যে রুবিডিয়ামও ব্যবহার করা চলে (সিজিয়াম দ্রষ্টব্য)।

স্ট্রন্‌সিয়াম (Sr), Z=৩৮

১৭৯০ সালে স্কটল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী ক্রাউফোর্ড (Crawford) স্ট্রন্‌সিয়ান শহরের সীসার খনি থেকে সংগৃহীত নমুনা নিয়ে গবেষণা করে প্রাকৃতিক স্ট্রন্‌সিয়াম ও বেরিয়াম কার্বনেটের মধ্যকার পার্থক্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন। ১৭৭২ সালে বিজ্ঞানী টমাস হোপ (Thomas Hope) ক্রাউফোর্ডের আবিষ্কৃত স্ট্রন্‌সিয়ামকে নানাবিধ প্রমাণভিত্তিক নতুন মৌল হিসেবে সমর্থন করেন। স্ট্রন্‌সিয়াম কার্বনেট আকরিকের প্রাপ্তিস্থান স্ট্রটন্‌সিয়াম শহরের নামানুসারেই এই নতুন মৌলটিকে স্ট্রন্‌সিয়াম (Strontium) নামকরণ করা হয়। ১৮০৮ সালে সর্বপ্রথম স্যার হামফ্রি ডেভি একে নিষ্কাশন করেন।

প্রকৃতিতে স্ট্রন্‌সিয়াম সাধারণত সালফেট রূপে সেলেসটাইট (Celestite) ও কার্বনেটরূপে স্ট্রন্‌সিয়ানাইট (Strontianite) আকরিকে পাওয়া যায়। শিলামণ্ডলে স্ট্রন্‌সিয়ামের পরিমাণ ০·০৪২%. আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ২.৬×১০$^{-৩}$ %.। তেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের মধ্যে স্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ ভস্মপাতের (fallout) আশু বিপদ নিহিত থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ও ভূমির সর্বত্র স্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ ছড়িয়ে আছে। রাসায়নিক দিক দিয়ে এটি ক্যালসিয়ামের অনুরূপ হওয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের কলাসমূহ স্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ গ্রহণ করে। এটি খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে দুধের সাথে মিশে

যেতে পারে। অধিক পরিমাণ স্ট্রন্‌সিয়াম-৯০ গ্রহণ করলে অস্থির কর্কট রোগ হতে পারে। স্ট্রন্‌সিয়াম ধাতুটির গলনাঙ্ক ৮০০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ১১৫০° সে.।

স্ট্রন্‌সিয়াম মৃৎক্ষার ধাতু দেখতে সাদা এবং নরম। এর নাইট্রেট আতশবাজিতে গাঢ় লাল রঙ যুক্ত করার জন্য, থারমায়নিক ক্যাথডে ও বৈদ্যুতিক বাতিতে ব্যবহৃত হয়। গুড় থেকে চিনি নিষ্কাশনের জন্য এর অক্সাইডের প্রয়োজন। স্ট্রন্‌সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বহুসংখ্যক জৈব পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাবান এবং গ্রীজ তৈরি করে। এ ছাড়াও স্ট্রনসিয়ামের কিছু যৌগ ওষুধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইট্‌রিয়াম (Y), Z=৩৯

১৭৮৮ সালে সুইডেনের ইটেরবীতে ইটেরবাইট (Ytterbite) নামে একটি আকরিক পাওয়া যায়। ১৭৯৪ সালে বিজ্ঞানী গ্যাডোলিন এই ইটেররাইটে এক নতুন মাটির সন্ধান পেলেন এবং গ্যাডোলিনাইট (Gadolinite) নামকরণ করেন। পরবর্তীতে অবশ্য এটি ইট্রিয়া মাটি নামেই পরিচিত হয়েছে। বেরজেলিয়াসের ছাত্র বিজ্ঞানী মোসানডের এই ইট্রিয়া মাটি থেকে ইটরিয়াম অক্সাইড, টারবিয়াম অক্সাইড ও এরবিয়াম অক্সাইড আলাদা করতে সক্ষম হন। ইট্রিয়া মাটির নূন ধাতু ইট্‌রিয়ামকে বিজ্ঞানী বোলার ১৮২৮ সালে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্বারা বিজারিত করে পৃথক করেন।

স্ক্যানডিয়ামের মতো ইট্‌রিয়াম দুর্লভ মাটির অন্তর্গত। এই ধাতুর প্রধান আকরিক হলো গ্যাডোলিনাইট। স্ক্যানডিনেভিয়া উপদ্বীপে প্রধানত পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ইউরোপে, যুক্তরাষ্ট্রে, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু কিছু অঞ্চলে এই ধাতুর আকরিকের সন্ধান মেলে। ভূত্বকে এই ধাতুর পরিমাণ খুবই কম, মাত্র ৫×১০$^{-৩}$%। ধাতুটির ষোলটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গেছে। ইট্‌রিয়ামের গলনাঙ্ক ১৪৭৫—২৫২৫° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩৫০০° সে.। এই ধাতুটি বিশুদ্ধ অবস্থায় খুব কম পাওয়া যায় বলে এর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নেই।

জার্কোনিয়াম (Zr), Z=৪০

১৭৮৯ সালে বিজ্ঞানী ক্লাপ্রথ জার্কোন (Zircon) আকরিকে এর মৌলিক পদার্থ জার্কোনিয়াম (Zirconium) আবিষ্কার করেন। ফরাসী ভাষায় Zerk হলো লাল পাথর আর আরবী ভাষায় Zargun হলো মূল্যবান। এ জন্যই হয়তো মৌলটির নাম জার্কোনিয়াম রাখা হয়। জার্কোন রঙিন পাথর। অলঙ্কারে এই পাথরটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

জার্কোনিয়াম ধাতুটি খুব সক্রিয় বলে সাধারণত যৌগ অবস্থায় থাকে। এর প্রধান আকরিক হলো জার্কোন। এটি সাধারণত তামাটে রঙের হয়ে থাকে। এর উপাদানের পরিবর্তনে রঙের পরিবর্তনও লক্ষণীয়। জার্কোন সাধরণত সমুদ্র সৈকতে এবং নদীর তীরের বালিতে দেখা যায়। বিশেষ করে ভারত, ব্রাজিল এবং ফ্লোরিডায় প্রচুর পরিমাণে এই আকরিকটি পাওয়া যায়। এ ছাড়া ব্যাডেলেয়াইট (Baddeleyite), এলপিডাইট (Elpidite) আকরিকও উল্লেখযোগ্য। ভূত্বকে ও শিলামণ্ডলে জার্কোনিয়ামের পরিমাণ ০.০২৫%। আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে $১০^{-২}$ %। জার্কোনিয়ামের পাঁচটি স্থায়ী ও চৌদ্দটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আছে। মৌলটির গলনাঙ্ক ১৮৫৭° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২৯০০° সে.।

জার্কোনিয়াম ধাতুর বহুলাংশই মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো রসায়ন শিল্পে, বিশেষ করে সালফিউরিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রতিরোধক হিসেবে জার্কোনিয়ামের পাত্র বা নলের ব্যবহার দেখা যায়। বস্ত্রশিল্পে, অনুঘটকের উপাদান হিসেবে, রঙশিল্পে, দুর্গন্ধনাশক (deodorants) হিসেবে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

নায়োবিয়াম (Nb), Z=৪১

১৭৫৩ সালে ব্রিটিশ যাদুঘরে কলম্বিয়া থেকে উপহারপ্রাপ্ত একটি খনিজ পদার্থ সংগৃহীত হয়। ১৮০১ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী হ্যাচেট (Hatchett) এই খনিজ পদার্থ থেকে একটি নতুন মৌল আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন এবং আকরিকটির প্রাপ্তিস্থান কলম্বিয়ার নামানুসারে এই নতুন মৌলটিকে কলম্বিয়াম নামকরণ করেন। ১৮০২ সালে সুইডিস রসায়নবিদ্ একেবের্গ (Ekeberg) দুইটি নতুন আকরিক ট্যানটালাইট (Tantalite) ও ইট্রোটানট্যালাইট (Yttrotantalite) থেকে অপর একটি অজ্ঞাত মৌল

banglainternet.com

আবিষ্কার করেন। এই আকরিকগুলিকে দ্রবীভূত করে আকরিকে অবস্থিত কলম্বিয়াম মৌল থেকে ঐ নতুন মৌলটিকে পৃথক করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর জটিলতায় পড়ে বারবার নিরাশ হন। ফলে মূল ধাতুটিকে প্রাচীন গ্রীক রূপকথার রাজা ট্যানটালাসের নামানুসারে ট্যানটালাম নামকরণ করেন। রূপকথায় আছে ট্যানটালাসের পিতা যিউস—পুত্রের উদ্ধত ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে টারটারাস নরকে পাঠান। সেখানে ট্যানটালাসের সামনে অথচ নাগালের বাইরে বহু খাবার-দাবার রেখে লোভের উদ্রেক সৃষ্টি করে উৎপীড়ন করতেন। ১৮৪৪ সালে বিজ্ঞানী রোসি (Rose) কলম্বাইট আকরিককে দুটি প্রায় সমধর্মী মৌলের সন্ধান পেলেন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে এই দুটি মৌলের একটি হলো একেবার্গের ট্যানটালাম আর অন্যটি হলো কলম্বিয়াম। তিনি গ্রীক রূপকথার ট্যানটালাসের কন্যা নাইওবীর (Niobe) নামানুসারে নায়োবিয়াম (Niobium) নব-নামকরণ করেন। সম্ভবত ১৯০৭ সালে বিজ্ঞানী ফন বোলটন (Von Bolton) সর্বপ্রথম নায়োবিয়ামকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করতে সমর্থ হন। এই ধাতুটিকে বর্তমান আমেরিকার রসায়নবিদ্‌রা নায়োবিয়াম নামেই ব্যবহার করেন, অথচ ধাতুবিদ্যাবিদ্‌রা এবং ধাতুশিল্পে এখনও এই পুরাতন কলম্বিয়াম নামেই অভিহিত করে থাকেন।

প্রকৃতিতে নায়োবিয়ামের সকল আকরিকেই কিছু-না-কিছু পরিমাণ ট্যানটালাম থাকে এবং উল্টোভাবে ট্যানটালামের কোনো আকরিকই নায়োবিয়াম মুক্ত নয়। নায়োবিয়ামের প্রধান প্রধান আকরিক হলো কলম্বাইট (Columbite), ট্যাণ্টালোকলম্বাইট (Tantalocolumbite), ট্যাণ্টালাইট (Tantalite), কপাইট (Coppite), স্যামারস্‌কাইট (Samarskite) ও ইউক্সেনাইট (Euxenite)। ভূত্বকে নায়োবিয়ামের পরিমাণ ৩.২×১০$^{-৫}$%. আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ৫×১০$^{-৫}$%. হয়। এ পর্যন্ত নায়োবিয়ামের তেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এই ধাতুটির গলনাঙ্ক, ২৫০০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩৩০০° সে.।

অনেক ধরনের ইস্পাতে ব্যবহৃত নায়োবিয়াম তার মরিচা প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। উচ্চ তাপমাত্রার ও অতিপরিবাহী সংকর ধাতুতে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণে ও ইলেকট্রনিক্‌সে এই

ধাতুটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাটবার হাতিয়ার তৈরিতেও এই ধাতুটি ব্যবহারযোগ্য।

মলিবডেনাম (Mo), Z=৪২

প্রাচীন গ্রীক ও রোমবাসীরা লিড সালফাইডকে (গালেনা Galena) সীসার অন্যান্য আকরিককে মলিবডায়েনা (Molybdaena) বলে জানত। যে সকল আকরিক গালেনার মতো কাল রঙের পরবর্তীতে তাদের বিশেষ করে গ্রাফাইট ও সমরূপের আকরিককে মলিবডেনাইট (Molybdenite) বলা হতো। গ্রাফাইট ও মলিবডেনাইট বাহ্যিক দিক দিয়ে দেখতে প্রায় একই ছিল বলে বহুদিন এদেরকে সমগোত্রের আকরিক হিসেবে গণ্য করা হতো। অবশ্য পরবর্তীতে তাদেরকে কালো সীসা (Black Lead) ও জলীয় সীসা (Water Lead) নামকরণ করা হয়। ১৭৭৮ সালে বিজ্ঞানী শীলে (Scheele) সর্বপ্রথম এদের পার্থক্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন। তিনি মলিবডেনাইটকে (জলীয় সীসা) নাইট্রিক এ্যাসিডের সাহায্যে বিযোজিত করে সাদা রঙের অক্সাইড প্রস্তুত করেন এবং মলিবডিক এসিড (Molybdic acid) নামকরণ করেন।

উক্ত অক্সাইডের মূল ধাতুটি সর্বপ্রথম ১৭৮২ সালে বিজ্ঞানী হেল্‌ম (Hjelm) বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করে মলিবডেনাম (Molybdenum) নামকরণ করেন।

প্রকৃতিতে এই ধাতুটি প্রধানত মলিবডেনাইট ও উলফেনাইট (Wulfenite) আকরিকে পাওয়া যায়। মলিবডেনাইট সর্বত্র কিন্তু স্বল্প পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। ভূত্বকে মলিবডেনামের পরিমাণ $১০^{-৩}$ %। মলিবডেনামের সাতটি স্থায়ী ও তেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সন্ধান মিলেছে। মলিবডেনাম খুব কঠিন ধাতু। এর গলনাঙ্ক ২৬২০° সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ৪৮০০° সে.।

সহজে কাটা যায় এমন কিছু ইস্পাত তৈরিতে ক্রোমিয়াম, নিকেল, কোবাল্ট ও ভ্যানাডিয়ামের পাশাপাশি মলিবডেনাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া রেডিও টিউবের গ্রীডে এবং ফিলামেণ্টে ও ইলেকট্রডস্-এ মলিবডেনাম ব্যবহার করা হয়। এর কিছু সংকর ধাতু উচ্চ তাপে স্থায়ী বলে রকেট গঠনে ব্যবহার্য।

banglainternet.com

রুথেনিয়াম (Ru), Z=৪৪

প্লাটিনাম গ্রুপের সবচেয়ে বিরল ধাতু হলো রুথেনিয়াম (Ruthenium)। তাই এই গ্রুপের প্রায় সব ধাতুগুলির শেষে ১৮৪৫ সালে রাশিয়ান রসায়নবিদ্ ক্লাউস উক্ত ধাতুটি আবিষ্কার করেন। মধ্যযুগে রাশিয়ার ল্যাটিন নাম ছিল রুথেনিয়া (Ruthenia)। এই বিজ্ঞানী মাতৃভূমির মধ্যযুগের নামানুসারেই আবিষ্কৃত মৌলটিকে রুথেনিয়াম নামকরণ করেন।

রুথেনিয়াম প্লাটিনামের স্পুটনিক। অম্লরাজের সাহায্যে—প্লাটিনাম আকরিককে পৃথকীকরণের পর অবশিষ্টাংশ অসমিরিডিয়ামে (Osmiridium) এই মৌলটি পাওয়া যায়। খুব কম সময়ই এর স্বতন্ত্র আকরিক ল্যাইউরাইটে (laurite) দেখা যায়। ভূত্বকে রুথেনিয়ামের পরিমাণ 5×10^{-6}%, আর লৌহ-উল্কাপিণ্ডে 10^{-6}%। রুথেনিয়াম সাতটি স্থায়ী আইসোটোপের মিশ্রণ। এ ছাড়াও নয়টি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। রুথেনিয়ামের গলনাঙ্ক ২৪৫০—২৫০০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৪৫০০° সে.।

রুথেনিয়াম উত্তম অনুঘটক। বিশেষ করে সমানুকরণ, উদজানন, জারন ও রিফরমিং বিক্রিয়ায় ধাতুটি ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রোডিয়াম (Rh), Z=৪৫

১৮০৩ সালে বিজ্ঞানী ওলাস্টোন (Wollaston) রোডিয়াম (Rhodium) আবিষ্কার করেন। এর বহু যৌগ সাধারণত গোলাপী-লাল রঙের হয়ে থাকে বলে গ্রীক শব্দ rhodon থেকে মৌলটিকে রোডিয়াম (Rhodium) নামকরণ করা হয়।

রোডিয়াম বিরল ধাতু। প্রকৃতিতে প্লাটিনামের আকরিকে সাধারণত পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণের বালিতে কিছু রোডিয়াম দেখা যায়। আর মেক্সিকোর স্বর্ণের খনিতে প্রায় ৪৩%। রোডিয়াম থাকে। তবে উল্লিখিত খনিতে এর পরিমাণ সাধারণত ০·৫—৪·৫%। পর্যন্ত দেখা যায়। শিলামণ্ডলে রোডিয়ামের পরিমাণ 10^{-7}%, ভূত্বকে 10^{-6}%। আর $8\cdot1\times10^{-8}$%। রোডিয়ামের মোলটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সন্ধান মিলেছে। এই ধাতুটির গলনাঙ্ক ১৯৬৩° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩৭০০° সে.।

প্রকৃতিতে এই ধাতুটি স্বল্প পরিমাণে পাওয়া গেলেও এর ব্যবহার খুব বেশি। প্লাটিনামের সঙ্গে এটি সংকর ধাতু তৈরি করে। এটি উচ্চ তাপ

নির্ধারক 'থার্মোকাপল' তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্রতিফলক যন্ত্রের উপরিভাগ আবৃত করতে এবং ধাতুর মরিচা প্রতিরোধকরূপে রোডিয়াম ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়াও উদজানন বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে রোডিয়ামের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

প্যালাডিয়াম (Pd), Z=৪৬

১৮০৩ সালে বিজ্ঞানী ওল্যাস্টোন (Wollaston) কাঁচা প্লাটিনাম আকরিকে এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন। তবে ব্রাজিলে খনিজীবীদের কাছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেও এই ধাতুটির সংকর ধাতু হিসেবে পরিচিত ছিল। ধাতুটি আবিষ্কারের অল্প কিছুকাল পূর্বে আবিষ্কৃত গ্রহনাপুঞ্জ প্যালাস (Pallas) -এর নামানুসারে এর প্যালাডিয়াম (Palladium) নামকরণ করা হয়।

এটি বিরল ধাতু। বিশুদ্ধ ধাতব প্যালাডিয়াম বিভিন্ন আকারের দানারূপে প্লাটিনাম আকরিকে, ব্রাজিলের স্বর্ণের খনিতে, কলম্বিয়ায় ও ককেসাসে পাওয়া যায়। অনেক সময় সোনা, রুপা অথবা এই দুটি ধাতুর সাথেই প্রাকৃতিক সংকর ধাতুরূপে লক্ষণীয়। ব্রাগাইট (Bragite) আকরিকে প্রায় ২০'/. প্যালাডিয়াম থাকে। সূর্যের বর্ণালীতে বিজ্ঞানী লকের (Lockyer) প্যালাডিয়াম রেখার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। ভূত্বকে এর পরিমাণ $১০^{-৬}$'/., শিলামণ্ডলে ৫×১০^{-৬}'/. আর লৌহ-উল্কাপিণ্ডে ৪×১০^{-৪}'/.। এ পর্যন্ত প্যালাডিয়ামের ছয়টি স্থায়ী ও চৌদ্দটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এই ধাতুটির গলনাঙ্ক ১৩৩৫'৬° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৪০০০° সে.।

প্যালাডিয়াম তীব্র ক্ষয় প্রতিরোধক। আস্তরণের জন্য এবং স্বর্ণ ও প্লাটিনামের সাথে মিশ্রিত করে সংকর ধাতু তৈরিতে প্যালাডিয়াম ব্যবহার করা হয়। এটি উদজানন বিক্রিয়ার উত্তম অনুঘটক।

banglainternet.com

সিলভার (Ag), Z=৪৭

খ্রীস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে থেকেই সিলভার (রুপা) পরিচিত। এটি অভিজাত ধাতুর অন্তর্গত। সিলভার খুব সাদা এবং চকচকে। এ জন্যই এর ল্যাটিন নাম আর্জেনটাম (Argentum) অর্থাৎ সাদা, উজ্জ্বল। এই Argentum শব্দ থেকেই এর রাসায়নিক সঙ্কেত Ag।

রাসায়নিকভাবে সক্রিয় নয় বলে প্রকৃতিতে অনেক সময় এই ধাতুটি বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। ১৮৮০ সালে স্পেনে প্রায় আট টন ওজনের একটি সিলভার পিণ্ডক পাওয়া গেছে। মেক্সিকো, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে মৌলিক সিলভার পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন আকরিকে যৌগরূপে সচরাচর দেখা যায়। এর প্রধান আকরিকগুলি হলো আর্জেণ্টাইট (Argentite), পাইরারজিরাইট (Pyrargyrite), প্রাউস্টাইট (Proustite), স্ট্রোমেয়ারাইট (stromeyerite), স্টিফেনাইট (Stephenite), ক্লোরারজিরাইট (Chlorargyrite), ব্রোমারজিরাইট (Bromargyrite) ও আয়োডারজিরাইট (Iodargyrite)। শিলামণ্ডলে ও ভূত্বকে সিলভারের পরিমাণ $১০^{-৫}$%. আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে $৩·৩\times১০^{-৪}$%.। সিলভারের দুইটি স্থায়ী ও চৌদ্দটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আছে। এর গলনাঙ্ক ৯৬০·৫° সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ১৯৫০° সে.।

সিলভার খুব নমনীয় ও ঘাতসহ ধাতু বলে সহজে পাতলা পাত ও তারে পরিণত করা যায়। এক গ্রাম সিলভারকে প্রায় দুই কিলোমিটার লম্বা তারে পরিণত করা যায়। মানুষ সিলভারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার শুরু থেকেই একে মুদ্রা বা দ্রব্যমূল্যের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকেও চীন, ইথিওপিয়া, আফগানিস্তান, ইরান প্রভৃতি দেশে সিলভারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে রাশিয়ায় মুদ্রা হিসেবে সিলভার কড়ি ব্যবহার করা হতো। দ্রব্যের মূল্য সিলভার কড়ির চেয়ে কম হলে তাকে রুবিচ অর্থাৎ কেটে কমান হতো। আর এই রুবিচ শব্দ থেকেই রাশিয়ান মুদ্রার নাম রুবল হয় বলে কথিত আছে।

banglainternet.com

সিলভার তাপ ও বিদ্যুতের উত্তম পরিবাহক। অলঙ্কার, মুদ্রা, বাসনপত্র প্রভৃতি প্রস্তুতে সিলভার ব্যবহার করা হয়। এর হ্যালোজেনজাত যৌগিক পদার্থগুলি অতি সহজেই আলোকে পরিবর্তিত হয় বলে আলোকচিত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সিলভার নাইট্রেট ওষুধে, অমোচনীয় কালিতে, আয়না রজতীকরণে এবং অন্যতম বিকারকরূপে ব্যবহার্য। সিলভার পানি নির্বীজিত করে। তাই পাইপ লাইন ও জলাধার তৈরিতে অনেক সময় ব্যবহার করা হয়।

ক্যাডমিয়াম (Cd), Z=৪৮

১৮১৭ সালে বিজ্ঞানী স্ট্রমেয়ার (Strohmeyer) ঔষধালয়ে বিক্রয় হচ্ছে এমন কিছু জিংক কার্বনেটের নমুনা নিয়ে গবেষণা করে ক্যাডমিয়াম (Cadmium) আবিষ্কার করেন। প্রাচীন গ্রীকে জিংকের এই আকরিকটি Cadmia নামে পরিচিত ছিল। জিংকের সঙ্গে ক্যাডমিয়াতে এই ধাতুটি সচরাচর পাওয়া যায় বলে উক্ত আকরিকটির নামানুসারেই নতুন মৌলটিকে ক্যাডমিয়াম নামকরণ করা হয়।

ক্যাডমিয়াম ধাতুটি প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় কখনও পাওয়া যায় না। বিশেষ করে জিংকের ক্যালামাইন (Calamine) ও স্ফ্যালেরাইট (Sphalerite) আকরিকে সালফাইডরূপে ক্যাডমিয়াম থাকে। বিশুদ্ধ ক্যাডমিয়াম সালফাইড আকরিক গ্রীনোকাইট (Greenokite) স্কটল্যাণ্ডে পাওয়া যায়। আমেরিকা, মেক্সিকো, কানাডা, পেরু, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় ক্যাডমিয়ামের প্রধান আকরিকগুলি পাওয়া যায়। শিলা-মণ্ডলে ও ভূত্বকে ক্যাডমিয়ামের পরিমাণ যথাক্রমে ৩×১০^{-৫}% ও ৫×১০^{-৪}%. আর লৌহ-উল্কাপিণ্ডে ৩×১০^{-৪}%। ক্যাডমিয়ামের আটটি স্থায়ী আইসোটোপ ও বারটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। ধাতুটির গলনাঙ্ক ৩২১° সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ৭৬৭° সে.।

ক্যাডমিয়াম শুভ্র, উজ্জ্বল, অত্যন্ত নমনীয় ও ঘাতসহ ধাতু। এর প্রাকৃতিক গুণাবলী টিনের অনুরূপ কিন্তু রাসায়নিক দিক দিয়ে দস্তার সমধর্মী। ধাতুলেপনে ক্যাডমিয়ামের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ, ক্যামেরা ইত্যাদির যন্ত্রাংশ, পিয়ানোর তারে ক্যাডমিয়াম ধাতুলেপনে মরিচা প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তবে ক্যাডমিয়ামের যৌগ খুব বিষাক্ত তাই খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসে এমন কোনো পাত্রে ব্যবহার অযোগ্য। নিম্ন গলনাঙ্ক-বিশিষ্ট সংকর ধাতু তৈরিতে ক্যাডমিয়াম ধাতু ব্যবহার্য।

banglainternet.com

ইন্ডিয়াম (In), Z=৪৯

১৮৬৩ সালে জার্মান রসায়নবিদ্ রেইখ (Reich) ও রিখটর (Richter) জিংক আকরিক স্ফ্যালেরাইটের অবশিষ্টাংশ নিয়ে বর্ণালী বিষয়ক গবেষণা করে একটি অজ্ঞাত মৌলের সন্ধান পান। মৌলটির বৈশিষ্ট্যমূলক

বর্ণালী রেখা গাঢ় নীল রঙের। Indigo tree বা নীল গাছ বিশেষ করে ভারতে (India) জন্মাত। ঐ সময় এই নীল গাছ থেকে প্রাপ্ত indigo গাঢ় নীল রঙ সুতা বা পশম রঙ করতে ব্যবহার করা হতো। তাই আবিষ্কৃত মৌলটিকে এর বর্ণালী রেখার নীল রঙের জন্য ইন্‌ডিয়াম (Indium) নামকরণ করা হয়।

সাধারণত সালফাইডরূপে অল্প পরিমাণে বিভিন্ন ব্রেণ্ড আকরিকে ইন্‌ডিয়াম পাওয়া যায়। এ ছাড়া টিন, টাঙ্গস্টেন ও ম্যাঙ্গানিজের আকরিকেও অল্প পরিমাণে ইন্‌ডিয়াম উপস্থিত থাকে। ভূত্বকে ইন্‌ডিয়ামের পরিমাণ $১০^{-৫}$%, আর লৌহ উল্কাপিণ্ডে $১০^{-৪}$%। এ পর্যন্ত ধাতুটির উনিশটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কৃত্রিম উপায়ে পাওয়া গেছে। প্রাকৃতিক ইন্‌ডিয়াম দুটি স্থায়ী আইসোটোপের মিশ্রণ। ধাতুটির গলনাঙ্ক ১৫৬·৪° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২০০০° সে.।

ইন্‌ডিয়াম খুব নরম ধাতু। নিম্ন গলনাঙ্কবিশিষ্ট সংকর ধাতু তৈরিতে ধাতুটি ব্যবহৃত হয়। ইন্‌ডিয়াম ফসফাইড সোলার ব্যাটারিতে ব্যবহার করা হয়। এর ফসফাইড, আরসেনাইড ও অ্যান্টিমোনাইড ট্র্যানজিস্টারে প্রয়োজনীয়।

টিন (Sn) Z=৫০

অতি প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞাত ধাতুগুলির অন্তর্গত টিন। খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে একে রোঞ্জরূপে ব্যবহার করা হতো। বাইবেলে মূল্যবান বস্তু হিসেবে বেডিল (Bedil) নামে টিনের উল্লেখ রয়েছে। বেদ ও মহাভারতে Trapu নামে টিনকে দেখান হয়েছে। সেজার (Caeser) ব্রিটেনে টিনের প্রাপ্তি সংবাদ ঘোষণা করে একে Plumbum Album নামকরণ করেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের ইংলণ্ডই ছিল একমাত্র দেশ সেখানে টিন পাওয়া যেত। বর্তমানে মালাক্কা, ইন্দোনেশিয়া ও বলিভিয়ায় প্রচুর পরিমাণে টিন পাওয়া যায়। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, থাইল্যাণ্ড, চীন ও পূর্ব জার্মানীতে কিছু পরিমাণ টিন পাওয়া যায়। টিনের একমাত্র উল্লেখযোগ্য আকরিক হলো ক্যাসিটেরাইট (Cassiterite)। ধাতুটির প্রথম শ্রেণীর খনিতে আকরিক সাধারণত অন্য শিলার সঙ্গে বিশেষ করে গ্রানাইট (Granite) আর দ্বিতীয় শ্রেণীর খনিতে টিনের আকরিক সাধারণত বালি কিংবা

banglainternet.com

মাটির সঙ্গে ছোট দানাকারে মিশ্রিত থাকে। এসব খনিতে টিনের পরিমাণ তত বেশি নয়। যদিও প্রধান আকরিকে বিশুদ্ধ ডাই-অক্সাইডে টিনের পরিমাণ ৭৮·৬২%। ভূত্বকে টিনের পরিমাণ ৪×১০$^{-৩}$%। আর লৌহ-উল্কাপিণ্ডে ৭·৭×১০$^{-৪}$%। টিনের দশটি স্থায়ী ও পনেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ জ্ঞাত। এর গলনাঙ্ক ২৩১·৮৯° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২২৭০° সে.।

পোরসেলিন (চীনামাটি) আবিষ্কারের পূর্বে বাসনপত্র টিন দিয়েই তৈরি হতো। কিন্তু বর্তমানে নিষ্কাশিত টিনের প্রায় অর্ধাংশই টিনপ্লেট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বহু সংকর ধাতু, যেমন ব্রোঞ্জ ও ব্রিটানিয়া মেটাল তৈরিতে টিনের প্রয়োজন হয়। মুদ্রা ও ছাপাখানার অক্ষর তৈরিতে টিন ধাতু ব্যবহৃত হয়।

অ্যানটিমোনি (Sb) Z=৫১

প্রাচীন কাল থেকেই এই অ্যানটিমোনির প্রধান আকরিক অ্যানটিমোনাইট (Antimonite) পরিচিত ছিল। তখন অক্ষিপক্ষ ও ভ্রূকে কাল করার জন্য ধাতুটি ব্যবহার করত। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় একে Stimmi আর ল্যাটিন ভাষায় Stibium বলা হতো। পরবর্তীতে সম্ভবত আরবী শব্দ থেকেই এর নাম করণ করা হয় অ্যানটিমোনিয়াম (Antimoninm)। আর এই আকরিক থেকে নিষ্কাশিত ধাতুটি অ্যানটিমোনি নামেই পরিচিত।

প্রকৃতিতে প্রধানত সালফাইডরূপে অ্যানটিমোনাইট আকরিকে অ্যানটিমোনি পাওয়া যায়। অক্সাইডরূপে আকরিক হলো ভ্যালেনটিনাইট (Valentinite)। খুব কম সময়ই একে মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায়। আর্সেনিকের মতো প্রায়ই সীসা, কপার ও সিলভার আকরিকে অ্যান্টিমোনির উপস্থিতি লক্ষণীয়। ভূত্বকে এর পরিমাণ ৫×১০$^{-৪}$%। আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ১০$^{-৪}$%। মৌলটির দুইটি স্থায়ী ও বিশটিরও বেশি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। এর গলনাঙ্ক ৬৩০·৫° সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ১৬৮০° সে.।

অ্যানটিমোনি হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস স্টিবাইন তৈরি করে। ব্যাবিট মেটাল, ব্রিটানিয়া মেটাল, টাইপ মেটাল, কাসটিং (ঢালাই ছাঁচ) ও ব্যাটারি নির্মাণে এবং ওষুধের উপাদান হিসেবে এই ধাতুটি ব্যবহৃত হয়।

টেলুরিয়াম (Te), Z=৫২

অরিফেরাস (Auriferous) আকরিকে ১৭৮২ সালে এই মৌলটি সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। প্রধান প্রধান ধর্মাবলী নিয়ে গবেষণার পর বিজ্ঞানী ক্লাপ্রথ পৃথিবীর সম্মানে (ল্যাটিন শব্দ Tellus-পৃথিবী) মৌলটির টেলুরিয়াম (Tellurium) নামকরণ করেন।

প্রকৃতিতে মৌলিক অবস্থায় এবং টেলুরাইড হিসেবে ধাতুটি দেখা যায়। প্রধান আকরিক হলো ন্যাগায়াগাইট (Nagyagite)। টেলুরিয়াম খুব বিরল মৌলিক পদার্থ। শিলামণ্ডলে ও ভূত্বকে এর পরিমাণ $১০^{-৬}$%। মৌলটি আটটি আইসোটোপের মিশ্রণ। কৃত্রিম উপায়ে এর ষোলটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এর গলনাঙ্ক ৪৫২° সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ১৩৯০° সে.।

টেলুরিয়াম ধূসর বর্ণের অনিয়তাকার চূর্ণ এবং সাদা স্ফটিকাকারে দেখা যায়। গুণাগুণের দিক দিয়ে গন্ধকের অনুরূপ। বাতাসে টেলুরিয়াম জ্বলতে থাকে। সীসাতে টেলুরিয়ামের উপস্থিতি সীসার কাঠিন্য বাড়ায়। কাচ ও চীনামাটির বাসন রঙানোর জন্য এবং ভালকানায়নে টেলুরিয়াম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিজিয়াম (Cs), Z=৫৫

১৮৬০ সালে বিজ্ঞানী বুনসেন (Bunsen) ডুর্কহেইম (Durkheim) এর খনিজ পানিকে বর্ণালী-বিশ্লেষক গবেষণা করে বর্ণালী রেখার বৈশিষ্ট্যমূলক দুটি নীল-ধূসর রঙের রেখাভিত্তিক এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন। ল্যাটিন ভাষায় Caesins (নীল-ধূসর) শব্দ থেকেই এই মৌলটির সিজিয়াম (Cesium) নামকরণ করা হয়।

প্রকৃতিতে সিজিয়াম বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে এবং অন্যান্য ক্ষার ধাতুর সঙ্গে ভূত্বকে একে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে লেপিডোলাইট (Lepidolite) আকরিকে এর পরিমাণ তুলনামূলক বেশি। ভূত্বকে ও শিলামণ্ডলে সিজিয়ামের পরিমাণ যথাক্রমে ৭×১০^{-৪}% ও $১০^{-৩}$%, আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে $১০^{-৫}$%। সিজিয়ামের একটি স্থায়ী ও প্রায় একুশটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। ধাতুটির গলনাঙ্ক ২৮·৪° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৬৯০° সে.।

banglainternet.com

সঙ্কর ধাতু ও ফটোসেল তৈরিতে সিজিয়াম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রকেটের জ্বালানি হিসেবে অনেক সময় এটি ব্যবহার করা হয়।

বেরিয়াম (Ba), Z=৫৬

১৬৬২ সালে Bologna-র এক মুচী হেভীস্পার-কে (বেরিয়াম সালফেট) জৈব পদার্থের সঙ্গে পোড়ানোর পর তা স্বতঃদীপ্ত গুণসম্পন্ন হয়েছে লক্ষ্য করেন। তখন থেকেই বেরিয়াম সালফেট পরিচিত হয়। ১৭৭৪ সালে বিজ্ঞানী শীলে সর্বপ্রথম বেরিয়াম অক্সাইড আবিষ্কার করেন তবে বিজ্ঞানী গ্যান (Gahn) এই বেরিয়াম অক্সাইড যে হেভীস্পার-এর মূল তা প্রমাণ করেন। এই অক্সাইডকে গ্রীক শব্দ barus অর্থাৎ ভারি থেকে ব্যারিটা (Baryta) নামকরণ করা হয়। আর ১৮০৮ সালে বিজ্ঞানী ডেভী সর্বপ্রথম যৌগ থেকে তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে মূল ধাতু বেরিয়াম (Barium) পৃথক করতে সক্ষম হন। বেরিয়াম প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণ যৌগরূপে ছড়িয়ে আছে। ভূত্বকে এর পরিমাণ ০·০৫%। আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ৯×১০^{-৪}%। প্রাকৃতিক বেরিয়াম সাতটি স্থায়ী আইসোটোপের মিশ্রণ। এ ছাড়াও পনেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। ধাতুটির গলনাঙ্ক ৮৫০° সে., স্ফুটনাঙ্ক ১১৪০° সে.।

অ্যালুমিনিয়াম অথবা ম্যাগনেসিয়ামের সাথে বেরিয়ামের সংকর ধাতু বৈদ্যুতিক বাল্‌ব তৈরিতে এবং বেরিয়াম অক্সাইড ক্যাথড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বেরিয়াম পারঅক্সাইড এবং বেরিয়াম সালফেট রঞ্জক হিসেবে ব্যবহার্য। এর নাইট্রেট ও ক্লোরেট আতশ বাজিতে ব্যবহার করা হয়।

ল্যান্থানাম (La), Z=৫৭

১৮০৩ সালে বিজ্ঞানী ক্লাপ্রথ (Klaproth) ও বেরজেলিয়াস (Berzelius) পৃথকভাবে একটি সুইডিশ আকরিক থেকে সেরিয়া (Ceria) নামে একটি নতুন মাটি পৃথক করেন। এই আকরিকটি পরবর্তীতে সেরাইট (Cerite) নামে পরিচিত হয়েছে। বিজ্ঞানী মোসানডের (Mosander) ১৮৩৯ সালে এই সেরাইট থেকে ল্যান্থানাম অক্সাইড ও পরবর্তীতে সিরিয়াম অক্সাইড ও ডাইডিমিয়াম (নিওডিমিয়াম এবং প্রাসিওডাইমিয়ামের মিশ্রণ) অক্সাইড পৃথক করতে সক্ষম হন। নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্যমূলক

রাসায়নিক বিক্রিয়ার অভাবে ধাতুটিকে অনেক শ্রমের পর সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে মোসানডের গ্রীক শব্দ Lantano (লুকিয়ে থাকা) থেকে এর নামকরণ ল্যান্থানাম (Lanthanum) করেন। অনেক গবেষণার পর মোসানডের পটাশিয়াম ক্লোরাইড দ্বারা ল্যান্থানাম অক্সাইডকে বিজারিত করে মূল ধাতুটিকে পৃথক করেন।

ল্যান্থানাম শ্রেণীর (Z=৫৭-৭১) প্রথম মৌল ল্যান্থানাম। এই শ্রেণীর ধাতুগুলির রাসায়নিক ধর্মাবলীর মধ্যে এক বিরাট সাদৃশ্য রয়েছে বলে এদের আবিষ্কার এবং সনাক্ত করতে অনেক কষ্ট হয়েছে।

দুর্লভ মৃত্তিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও ভূত্বকে ল্যান্থানাম আসলে তত দুর্লভ নয়। বিভিন্ন খনিজ পদার্থে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। ভূত্বকে এর পরিমাণ ৬·৫×১০$^{-৪}$%. অর্থাৎ আয়োডিনের চেয়ে ৬·৫ গুণ আর স্বর্ণের চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি। শিলামণ্ডলে এর পরিমাণ ১·৮×১০$^{-৩}$%. ; আর উল্কাপিণ্ডে ২·২×১০$^{-৪}$%. । এই ধাতুটির দুইটি স্থায়ী ও সতেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। ধাতুটি খুব নরম। এর গলনাঙ্ক ৯২০° সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ৪৫১৫° সে.।

ল্যান্থানাম এবং অন্য সকল ল্যান্থানাইড (Z=৫৮-৭১) মেটালর্জীতে বিশেষ করে দুর্গল সংকর ধাতু উৎপাদন এবং ইস্পাতের যান্ত্রিক গুণাগুণ বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিউক্লিয়ার প্রযুক্তিতে, আলোক বিজ্ঞানে, কাচশিল্পে, দুর্গল তড়িৎদ্বার তৈরিতে, অনুঘটক হিসেবে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে এবং ওষুধে এই শ্রেণীর ধাতুগুলির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

সিরিয়াম (Ce), Z=৫৮

১৮৩৩ সালে বিজ্ঞানী ক্লাপ্রথ ও বেরজেলিয়াস পৃথকভাবে সেরিয়া মাটি থেকে এই মৌলটি আবিষ্কার করেন। তখনকার আবিষ্কৃত গ্রহনাপুঞ্জ সেরিসের (Ceris) নামানুসারে এই ধাতুটির সিরিয়াম (Cerium) নামকরণ হয়।

সিরিয়াম এবং অন্যান্য দুর্লভ মৃত্তিকা ধাতুসমূহ (Z=৫৭-৭১) খুব অল্প পরিমাণে অথবা কখনও কখনও দ্বিতীয় ধাতু হিসেবে ক্যালসাইট (Calcite), ফেল্ডস্পার, অ্যাপাটাইট (Apatite) পিরোমোরফাইট (Pyromorpyite), ইউরেনেট (Uranate), টাঙ্গস্টেট (Tungstate) ইত্যাদি আকরিকে পাওয়া যায়। ল্যান্থানাম শ্রেণীর ধাতুগুলির মধ্যে ভূত্বকে

banglainternet.com

সিরিয়ামের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি (২·৯×১০$^{-৩}$%)। প্রাকৃতিক সিরিয়াম সাধারণত তিনটি স্থায়ী আইসোটোপের মিশ্রণ। এ পর্যন্ত সর্বমোট পনেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সন্ধান মিলেছে। ধাতুটি নিম্ন তাপমাত্রায় ফেরো ম্যাগনেটিক। এর গলনাঙ্ক ৮০৪° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩৬০০° সে.।

দুর্লভ মৃত্তিকা ধাতুর সাধারণ ব্যবহারসমূহ ল্যান্থানামে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এনামেল এবং কেলাস প্রস্তুতে সিরিয়ামের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

প্রাসিয়োডাইমিয়াম (Pr) Z=৫৯; নিয়োডিমিয়াম (Nd), Z=৬০

১৮৪১ সালে বিজ্ঞানী মোসানডের দুর্লভ মাটির মিশ্রণ থেকে গোলাপী রঙের এক নতুন অক্সাইড পৃথক করে নতুন মৌল বলে ঘোষণা করেন। তিনি এর নামকরণ করেন ডাই-ডিমিয়াম। ১৮৮৫ সালে বিজ্ঞানী ওয়েলস্‌বাখ (Welsbach) আংশিক কেলাসন পদ্ধতি ব্যবহার করে এই ডাইডিমিয়ামকে প্রাসিয়োডাইমিয়াম (Prasinos—সবুজ, এর লবণের রঙ) ও নিয়োডিমিয়াম (এর লবণের রঙ গোলাপী) ভাগ করতে সক্ষম হন। প্রাসিয়োডাইমিয়ামের (Praseodymium) পনেরটি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এর গলনাঙ্ক ১০২৪° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩৪৫০° সে.। নিয়োডিমিয়াম (Neodymium) ছয়টি স্থায়ী আইসোটোপের মিশ্রণ। এর একটিমাত্র তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আছে। ধাতুটির গলনাঙ্ক ১০২৪° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩৩০০° সে.।

এই ধাতু দুইটির আকরিকসমূহ সিরিয়ামে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ল্যান্থানামে উল্লেখিত ব্যবহারসমূহ ছাড়াও এনামেল ও রঙিন কাচ তৈরিতে ধাতু দুইটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

banglainternet.com

স্যামারিয়াম (Sm) Z=৬২

১৮৭৯ সালে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী লেকক্ ডে বুয়াবদ্‌রান (Lecoq de Boisbaudran) সেরিয়া মাটিতে প্রাপ্ত আকরিক স্যামারস্কাইট (Samarskite) থেকে স্যামারিয়াম (Samarium) ধাতুটিকে পৃথক করতে সক্ষম হন। প্রকৃতিতে এই ধাতুটির নয়টি আইসোটোপ পাওয়া গেছে। ধাতুটির

গলনাঙ্ক ১০৫২° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ১৯০০° সে.। দুর্লভ মৃত্তিকার ধাতু স্যামারিয়ামের সাধারণ ব্যবহার সম্বন্ধে ল্যান্থানামে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউরোপিয়াম (Eu), Z=৬৩

১৯০১ সালে বিজ্ঞানী ডেমারসে (Demarcay) স্যামারিয়ামে ও ম্যাগনেসিয়ামের দ্বি-ধাতুক লবণ থেকে ইউরোপিয়াম (Europium) আবিষ্কার করেন। এটি টেরবিয়া মাটির অন্তর্গত বিরল মৃত্তিকা ধাতু। এর দুটি স্থায়ী আইসোটোপ ছাড়াও প্রায় সতেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত। এর গলনাঙ্ক ৯০০° সেঃ আর স্ফুটনাঙ্ক ১৭০০° সে.। ভূত্বকে ধাতুটির পরিমাণ ২×১০$^{-৫}$%, আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ৩·৩×১০$^{-৫}$%.

ল্যান্থানামে উল্লিখিত ব্যবহার ছাড়াও পারিমাণবিক বিদ্যুত শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে ইউরোপিয়াম ব্যবহৃত হয়।

গ্যাডোলিনিয়াম (Gd), Z=৬৪

১৮৮০ সালে বিজ্ঞানী ম্যারিনাক (Marignac) স্যামারস্কাইট আকরিক থেকে গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড পৃথক করেন। ১৮৮৬ সালে বিজ্ঞানী লেকক্ ডে বুরাবদ্রান গ্যাডোলিনিয়াম (Gadolinium) আবিষ্কার করেন। তিনি ফিনল্যেণ্ডের রাসায়নবিদ্ গ্যাডোলিনের নামানুসারে এই নামকরণ করেন।

এটি বিরল মৃত্তিকা টেরবিয়ার অন্তর্গত ধাতু। ভূত্বকে গ্যাডোলিনিয়ামের পরিমাণ ৭·৫×১০$^{-৪}$%.। বিভিন্ন নিউক্লীয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে এই ধাতুটির দশটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এর গলনাঙ্ক ১৩৫০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩০০০° সে.। ল্যান্থানামে উল্লিখিত ব্যবহার ছাড়াও নিউক্লিয়ার প্রযুক্তিবিদ্যায় গ্যাডোলিনিয়াম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্যারাচুম্বকীয় (Paramagnetic) এর সালফেট নিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার্য।

টারবিয়াম (Tb) Z=৬৫

১৮৪৩ সালে বিজ্ঞানী মোসানডের সুইডেনের ইটেরবীর ইট্রিয়া মাটি থেকে টারবিয়াম আবিষ্কার করেন। এটি বিরল মৃত্তিকার ধাতু। ল্যান্থানাম শ্রেণীর

banglainternet.com

ধাতুগুলির মধ্যে পাথুরে উল্কাপিণ্ডে টারবিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ($৬\cdot৪\times১০^{-৪}$%)। টারবিয়ামের সতেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এই ধাতুর গলনাঙ্ক ১৪০০-১৫০০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ~২৮০০° সে.।

টারবিয়ামের সাধারণ ব্যবহার ল্যান্থানামে উল্লেখ করা হয়েছে। টারবিয়াম এবং এর কিছু কিছু যৌগ প্যারাচুম্বকীয় পদার্থ।

ডিসপ্রসিয়াম (Dy), Z=৬৬

১৮৮৬ সালে বিজ্ঞানী লেকক্ ডে বুয়াবদ্‌রান দুর্লভ মৃত্তিকা ধাতুর মিশ্রণকে আংশিক পাতন (Fractional Distillation) করে বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্যে ডিসপ্রসিয়াম (Dysprosium) আবিষ্কার করেন। এই ধাতুটি দুর্লভ মৃত্তিকা ইট্রিয়ার অন্তর্গত।

বর্তমানে এই ধাতুর তেরটি আইসোটোপ জানা আছে। ডিসপ্রসিয়ামের গলনাঙ্ক ১৪৭৫—১৫০০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ~ ২৬০০° সে.।

এই ধাতুটির বৈশিষ্ট্য হলো ধাতুটি অতি চুম্বকী এবং বিভিন্ন তাপমাত্রায় প্যারাচুম্বকীয়, প্রতিফেরো-চুম্বকীয় (Anti-ferromaguetic) অথবা ফেরোচুম্বকীয় ধর্ম প্রকাশ করে।

হোল্‌মিয়াম (Ho), Z=৬৭

এই ধাতুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সুইডিশ বিজ্ঞানী সরেট কিন্তু ১৮৭৯ সালে বিজ্ঞানী ক্লেভে (Cleve) দুর্লভ মৃত্তিকা এরবিয়া থেকে মৌলটি আবিষ্কার করেন। নিজ শহর স্টকহোম-এর সম্মানে আবিস্কৃত নতুন মৌলটিকে হোল্‌মিয়াম (Holmium) নামকরণ করেন। এ পর্যন্ত হোল্‌মিয়ামের বিশটি কৃত্রিম আইসোটোপ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

banglainternet.com

ধাতব হোল্‌মিয়াম প্যারাচুম্বকীয় পদার্থ। এর গলনাঙ্ক হলো ১৪৭৫ — ১৫২৫° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২৭০০° সে.।

এরবিয়াম (Er), Z=৬৮

১৮৪৩ সালে বিজ্ঞানী মোসানডের ইট্রিয়া মাটি থেকে আংশিক কেলাসন (Fractional Crystallization) করে একই সময়ে এরবিয়াম

(Erbium) ও টারবিয়াম আবিষ্কার করেন। সুইডেনের ছোট শহর ইটেরবিতে এই দুর্লভ মাটি ইট্রিয়া পাওয়া গেছে। তাই বিশেষ করে এই মাটি থেকে প্রাপ্ত টারবিয়াস, এরবিয়াম ও ইটারবিয়াম (Ytterbium) মৌল তিনটিকে শহরটির নামের সাথে সাদৃশ্য রেখেই নামকরণ করা হয়।

এরবিয়ামের ছয়টি স্থায়ী আইসোটোপ ছাড়াও চৌদ্দটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আছে।

এরবিয়ামের গলনাঙ্ক ১৪৭৫-১৫২৫° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২৬০০° সে.।

থুলিয়াম (Tm), Z=৬৯

১৮৭৯ সালে বিজ্ঞানী ক্লেভে এরবিয়া মাটি থেকে এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন। স্কান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের প্রাচীন নাম থুলের (Thule) নামানুসারে এই বিরল মৃত্তিকা ধাতুটিকে থুলিয়াম (Thulium) নামকরণ করা হয়।

ল্যান্থানাইড শ্রেণীর ধাতুগুলির মধ্যে পাথুরে উল্কাপিণ্ডে থুলিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে কম (৩.৮×১০^{-৫}%)। এই ধাতুটির সতেরটি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। থুলিয়াম ধাতুর গলনাঙ্ক হলো ১৫০০—১৫৫০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২৪০০° সে.। এর সাধারণ ব্যবহার সম্বন্ধে ল্যান্থানামে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইটারবিয়াম (Yb), Z=৭০

ইট্রিয়া মাটির শ্রেণীভুক্ত এরবিয়া মাটিকে প্রথমে কেবল একটিমাত্র ধাতু এরবিয়ামের অক্সাইড হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু বিজ্ঞানী ম্যারিনাক (Marignac) ১৮৭৮ সালে গোলাপী রঙের এরবিয়া মাটি থেকে অজ্ঞাত একটি মৌলের সাদা অক্সাইড পৃথক করতে সক্ষম হন। এই অক্সাইডটি ইটরিয়াম অক্সাইড ও এরবিয়াম অক্সাইডের মাঝামাঝি ধর্মের ছিল তাই একে ইটারবিয়াম অক্সাইড আর মূল ধাতুকে ইটারবিয়াম (Ytterbium) নামকরণ করা হয়।

ইটারবিয়ামের এগারটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এই ধাতুটির গলনাঙ্ক তুলনামূলক নিম্নমানের ৮২৪° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ১৮০০° সে.।

বিরল মৃত্তিকা ধাতু ইটারবিয়ামের ব্যবহার ল্যান্থানামে উল্লেখ করা হয়েছে।

লুটেসিয়াম (Lu), Z=৭১

১৯০৫ সালে বিজ্ঞানী ওয়েলসবাখ (Welsbach) বর্ণালী-বিষয়ক গবেষণা করে লক্ষ্য করলেন যে বিজ্ঞানী ম্যারিনাকের আবিষ্কৃত ইটারবিয়াম বিশুদ্ধ নয়। পরবর্তীতে ১৯০৭ সালে তিনি আংশিক কেলাসন পদ্ধতিতে এ থেকে একটি অজ্ঞাত মৌলের প্রায় বিশুদ্ধ অক্সাইড পৃথক করতে সক্ষম হলেন এবং এর নামকরণ করেন ক্যাসিওপিয়াম (Cassiopeium)। একই সময় পৃথক ভাবে ফরাসী রাসায়নবিদ্ আরবেইন (Urbain) ইটারবিয়াম নাইট্রেটকে একই পদ্ধতিতে অর্থাৎ আংশিক কেলাসন করে ল্যান্থানাইড শ্রেণীর সর্বশেষ মৌলটি আবিষ্কার করেন এবং প্যারিসের প্রাচীন নাম লুটেস (Lutece)-এর নামানুসারে লুটেসিয়াম (Lutecium) নামকরণ করেন।

এই মৌলটির সর্বমোট বারটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এই ধাতুটির গলনাঙ্ক হলো ১৬৫০—১৭৫০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক প্রায় ৩৫০০° সেঃ।

বিরল মৃত্তিকা ধাতু লুটেসিয়ামের ব্যবহারসমূহ ল্যান্থানামে উল্লেখ করা হয়েছে।

হ্যাফনিয়াম (HF), Z=৭২

হ্যাফনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা বাহাত্তর। ধাতুটি আবিষ্কার করার আগেই মোজলের সূত্র (Moseley law) ভিত্তিক এক্সরে বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দেখান হয়েছিল যে উক্ত পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটি এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। এবং বলা হয়েছিল যে এই মৌলটি দুর্লভ মৃত্তিকা ধাতুর অন্তর্গত না-হয়ে জার্কোনিয়ামের অনুরূপ হবে। আশা করা হয়েছিল প্রকৃতিতে জার্কোনিয়ামের সঙ্গেই একে পাওয়া যাবে। সত্যিকারে ঘটলোও তাই। ১৯২২ সালে হাঙ্গেরীর রসায়নবিদ্ হেভেসি (Hevesy) ও ডেনিস পদার্থবিদ্ কসটের (Coster) এক্সরে বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে জার্কোনিয়ামের আকরিকে এই ধাতুটিকে আবিষ্কার করেন। কোপেনহেগেন (Copenhagen)

banglainternet.com

শহর যেখানে এই ধাতুটি আবিষ্কৃত হয়েছে, ল্যাটিন নাম Hafniae-এর স্মরণে এর নামকরণ করা হয় হ্যাফনিয়াম (Hafnium)।

হ্যাফনিয়ামকে সবসময়ই জার্কোনিয়ামের আকরিকে দেখা যায়। প্রায় সকল জার্কোনেই (Zircon) ১%. এর বেশি হ্যাফনিয়াম অক্সাইড থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জার্কোনিয়ামের সঙ্গেই হ্যাফনিয়াম ধাতুটি নিষ্কাশন করা হয়। উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে জার্কোন ও ব্যাডেলেয়াইট আকরিক উল্লেখযোগ্য।

ভূত্বকে হ্যাফনিয়ামের পরিমাণ 8×10^{-8}%. আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে 10^{-8}%. দেখা যায়।

এই ধাতুটির বারটি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। হ্যাফনিয়ামের গলনাঙ্ক হলো ২০০০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩২০০° সে.।

নিউক্লিয়ার পদ্ধতিতে, এক্সরে যন্ত্র ও বৈদ্যুতিক বাল্‌ব-এর ক্যাথড তৈরিতে হ্যাফনিয়াম ধাতু ব্যবহার করা হয়। এর অক্সাইড, নাইট্রাইড ও কার্বাইড অদাহ্য পদার্থ প্রস্তুতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ট্যানটালাম (Ta), Z=৭৩

১৮০২ খ্রীস্টাব্দে সুইডিশ বিজ্ঞানী একেবের্গ সুইডেনের ইটেরবী এবং ফিনল্যাণ্ডের কিমিটো (Kimito) শহরে প্রাপ্ত দুইটি আকরিকে এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন। গ্রীক রূপকথার বীর ট্যানটালাসের নামানুসারে একেবের্গ এই ধাতুটিকে ট্যানটালাম (Tantalum) আর আকরিক দুইটিকে ট্যানটালাইট ও ইট্রোট্যানটালাইট নামকরণ করেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রকৃতিতে ট্যানটালামকে প্রায় সব সময়ই নায়োবিয়ামের সাথে দেখা যায়। ইউরোপে প্রধানত ফিনল্যাণ্ড ও স্কাণ্ডিনেভিয়ায় ট্যানটালাম দেখা যায়। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর পরিমাণে এই ধাতুটি পাওয়া যায়। ভূত্বকে ট্যানটালামের পরিমাণ $2{\cdot}8\times10^{-4}$%. আর লৌহ উল্কাপিণ্ডে 6×10^{-6}%.।

এ পর্যন্ত ট্যানটালামের তেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করা গেছে। ধাতুটির গলনাঙ্ক ২৯০০—৩০০০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৫৩০০—৫৬০০° সে.।

ইলেক্ট্রনিক্সে, তড়িৎদ্বার প্রস্তুতে, পরীক্ষাগারে অস্ত্র চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নির্মাণে ট্যানটালাম ব্যবহৃত হয়। এর সংকর ধাতু মরিচা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। ইস্পাতে ট্যানটালাম ব্যবহার করা হয়।

টাঙ্গস্টেন (W), Z=৭৪

এই ধাতুটি আবিষ্কারের ইতিহাস শুরু হয় ১৭৫৫ সালে বিজ্ঞানী ক্রনস্টেডের টাঙ্গস্টেন আকরিক নিয়ে গবেষণা দিয়ে। তিনিই এই আকরিকটিকে টাঙ্গস্টেন নামকরণ করেন। সুইডিস ভাষায় এর অর্থ হলো ভারি পাথর। ১৭৮১ সালে বিজ্ঞানী শীলে এই আকরিকটিতে টাঙ্গস্টেন অর্থাৎ এর অক্সাইড আবিষ্কার করেন। সাধারণত পরবর্তীতে এই আকরিকটি শেলাইট (Scheelite) নামেই পরিচিত হয়। এর অল্প কিছু পরে স্পেনের দুই রসায়নবিদ্ (দুই ভাই d' Elhuyar) উলফ্রামাইটে (Wolframite) উক্ত অক্সাইডটি লৌহ এবং ম্যাঙ্গানিজের অক্সাইডে সংযুক্ত অবস্থায় পেলেন। তাহাড়া পরবর্তীতে এই অক্সাইডকে বিজারিত করে মূল ধাতু টাঙ্গস্টেন পৃথক করেন। টাঙ্গস্টেন এবং উলফ্রামাইট উভয় আকরিকেই ধাতুটিকে পাওয়া গেছে বলে বর্তমানে টাঙ্গস্টেন (Tungsten) এবং উলফ্রাম (Wolfram) এই দুই নামেই পরিচিত। জার্মান ও রুশ ভাষায় একে উলফ্রাম আর ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় টাঙ্গস্টেন নাম ব্যবহার করা হয়।

প্রকৃতিতে টাঙ্গস্টেন সাধারণত অক্সাইডরূপে অন্য অক্সাইডের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। এর প্রধান আকরিকগুলি হলো উলফ্রামাইট, শেলাইট, ও স্টোলজাইট (Stolzite)। ভূত্বকে টাঙ্গস্টেনের পরিমাণ ৭×১০^{-৪}%। প্রকৃতিতে এর পাঁচটি আইসোটোপ পাওয়া যায়।

টাঙ্গস্টেনের গলনাঙ্ক ৩৪১৮২° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৫৭০০° সে.। এর গলনাঙ্ক অত্যাধিক বলে এবং উত্তপ্ত করতে অপেক্ষাকৃত কম বিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োজন হয় বলে ধাতুটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্টে ব্যবহৃত হয়। ধাতুটি নমনীয়। এর দ্বারা প্রস্তুত তারের প্রসারণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। এর সংকর ধাতুগুলি অত্যন্ত কঠিন ও শক্ত হয় বলে শিল্পক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অত্যধিক।

রিনিয়াম (Re), Z=৭৫

১৯২৫ সালে বিজ্ঞানী নোড্ডাক (Noddack) ও বের্গ প্লাটিনামের আকরিকে এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন। জার্মানীর একটি প্রদেশ ও নদী রিন (Rhine)-এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় রিনিয়াম (Rhenium)।

রিনিয়াম বিরল ধাতু। এর নিজস্ব কোনো আকরিক নেই। তবে অন্য কিছু কিছু মৌল, যেমন মলিবডিনাম, কপার, প্যালেডিয়াম, জিংক ও প্লাটিনামের আকরিকে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। বিশেষ করে মলিবডেনাইট আকরিকে এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (৬×১০^{-৫}—২×১০^{-৩}%।)। বিজ্ঞানী নোড্ডাক ৬৬০ কিলোগ্রাম মলিবডেনাইট আকরিক থেকে মাত্র ১ গ্রাম বিশুদ্ধ রিনিয়াম আলাদা করতে সক্ষম হন। ভূত্বকে এবং শিলামণ্ডলের মাত্র $১০^{-৭}$% হয় রিনিয়াম আর লৌহ উল্কাপিণ্ডে এর পরিমাণ ৮.৫×১০^{-৫}%।

প্রকৃতিতে একটি স্থায়ী ও একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের মিশ্রণ হিসেবে এটি দেখা যায়। সর্বমোট ষোলটি কৃত্রিম আইসোটোপ প্রস্তুত করা গেছে। রিনিয়াম ধাতুর গলনাঙ্ক ৩১৮০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৫৮৭০° সে.।

বিরল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও রিনিয়াম এবং এর সংকরধাতু বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রনিক্সের নকশায়, থার্মোকাপলে, অনুঘটক হিসেবে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

অস্‌মিয়াম (Os), Z=৭৬

দুজন ফরাসী বিজ্ঞানী ফোরক্রোয় (Fourcroy) ও ভকেলিন (Vauquelin) প্লাটিনামের আকরিক নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে অম্লরাজে ধাতুটি পুরোপুরি দ্রবীভূত না-হয়ে কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আর এই অবশিষ্টাংশটুকু নাইট্রিক এসিডে ফেলার পর কিছু বাষ্প নির্গত হয়ে চোখে প্রদাহ সৃষ্টি করে। সম্ভবত তা ছিল অস্‌মিয়াম টেট্রাঅক্সাইড। বিজ্ঞানী টেন্নান্ট (Tennant) ১৮০৪ সালে এই উদ্বায়ী অক্সাইড থেকে মূল ধাতুটিকে পৃথক করেন এবং এর বৈশিষ্ট্যমূলক তীব্র ঘ্রাণের জন্য অস্‌মিয়াম (Osmium—গ্রীক ভাষায় ঘ্রাণ) নামকরণ করেন।

প্লাটিনামের খনিতে সাধারণত ইরিডিয়ামের সাথে অস্‌মিয়াম সংকর ধাতু অস্‌মিরিয়াডিম (Osmiridium)-রূপে থাকে। এতে অস্‌মিয়ামের

পরিমাণ ১৭—৮০%. হতে পারে। সোভিয়েত প্লাটিনাম খনিতে অস্‌মিরিডিয়ামের পরিমাণ ০.৫—২.৫%.। অস্ট্রেলিয়ার খনিতে প্রায় ৩৭%. পর্যন্ত হয়। তবে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রায় বিশুদ্ধ অস্‌মিরিডিয়াম দেখা যায়।

শিলামণ্ডলে ও ভূত্বকে অস্‌মিয়ামের পরিমাণ ৫×১০^{-৬}%, আর লৌহ উল্কাপিণ্ডে ৭৬×১০^{-৪}%.।

এ পর্যন্ত অসমিয়ামের নয়টি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে।

মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে অসমিয়ামের আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্বাধিক। এর গলনাঙ্ক ৩০৪৫° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৫০২০° সে.।

অস্‌মিয়ামের সংকর ধাতু অসমিরিডিয়াম ঝরনা কলমে নিবের ও গ্রামোফোন সুচের সূক্ষ্মাগ্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্লাটিনামের কাঠিন্য বৃদ্ধির জন্য এর সাথে অসমিয়াম যোগে সংকর ধাতু প্রস্তুত করা হয়।

ইরিডিয়াম (Ir), Z=৭৭

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী টেনান্ট এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন। ধাতুটির বিভিন্ন লবণের বিচিত্র রঙের জন্য গ্রীক শব্দ iris—রামধনু থেকে এর ইরিডিয়াম (Iridium) নামকরণ করা হয়।

ইরিডিয়ামকে প্রায়ই প্লাটিনামের সঙ্গে কখনো কখনো অস্‌মিয়ামের সঙ্গে সংকর ধাতুরূপে দেখা যায়। প্রায় সকল প্লাটিনামের খনিতে সংকর ধাতু অস্‌মিরিডিয়াম ক্ষুদ্র কণা বা অপেক্ষাকৃত বড় দানাকারে থাকে। ভূত্বকে ও শিলামণ্ডলে ইরিডিয়ামের পরিমাণ যথাক্রমে $১০^{-৬}$%. ও $১০^{-৭}$%. আর লৌহ-উল্কাপিণ্ডে ৩×১০^{-৪}%.।

এ পর্যন্ত ইরিডিয়ামের প্রায় পঁচিশটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এই ধাতুটি অতি শক্ত ও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সর্বাধিক ভারি মৌলিক পদার্থসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইরিডিয়ামের গলনাঙ্ক ২৪৪৪° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৪৪০০° সে.।

ইরিডিয়ামের সংকর ধাতুসমূহ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর সংকর ধাতু আবহাওয়াতে ও অপর জিনিসের সংস্পর্শে সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এজন্যে বাটখাড়া, যন্ত্রপাতি, বিদ্যুতযন্ত্রের সংযোগস্থল এবং ঝরনা কলমের নিবের অগ্রভাগ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

banglainternet.com

প্লাটিনাম (Pt), Z=৭৮

প্রাচীনকালে প্লাটিনাম পরিচিত ছিল কিনা আজ পর্যন্ত তা পরিষ্কার হয় নি। যদিও কলম্বাসের আবিষ্কারের পূর্বেই রেড ইণ্ডিয়ানরা মধ্য আমেরিকায় প্লাটিনাম ও সোনার আকরিক দিয়ে কিছু কিছু দ্রব্য তৈরি করতো। ১৭৩৫ সালে বিজ্ঞানী আনতোনিও ডে উল্লোয়া (Antonio De Ulloa) কলম্বিয়ার সোনার আকরিকে এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী ওয়াটসন (Watson) ১৭৫০ সালে স্পেনিশ শব্দ প্লাটিনাস (Platinas—রুপা) থেকে প্লাটিনাম (Platinum) নামকরণ করেন।

প্রকৃতিতে প্লাটিনামকে প্লাটিনাম শ্রেণীর ধাতুর সঙ্গে এবং অন্যান্য ধাতু, যেমন লোহা, সীসা, কপার, সোনা ও সিলভারের সঙ্গে মিশ্রণ হিসেবে পাওয়া যায়। আকরিক হিসেবে স্পেরিলাইট (Sperrylite) উল্লেখযোগ্য। শিলামণ্ডলে ও ভূত্বকে প্লাটিনামের পরিমাণ যথাক্রমে ৫×১০^{-৭}% ও ২×১০^{-৫}%. আর লৌহ-উল্কাপিণ্ডে $১\cdot৯\times১০^{-৩}$%.

এ পর্যন্ত প্লাটিনামের বাইশটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কৃত্রিম উপায়ে পাওয়া গেছে।

প্লাটিনাম খুব নরম ও নমনীয় ধাতু। এর গলনাঙ্ক ১৭৭৩° সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ৪৫০০° সে.। শিল্পক্ষেত্রে এবং পরীক্ষাগারে প্রচুর পরিমানে প্লাটিনাম ব্যবহৃত হয়। পরিমাপ বিদ্যায়, থার্মোকাপল ও বিদ্যুৎযন্ত্রের সংযোগস্থল তৈরিতে প্লাটিনাম ব্যবহার করা হয়। আলোকচিত্রে ও রঞ্জনচিত্রে প্লাটিনামের কিছু কিছু যৌগের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

অরিয়াম (Au), Z=৭৯

অতি প্রাচীনকাল থেকেই অরিয়াম (সোনা) পরিচিত। সম্ভবত ধাতুর মধ্যে সোনার ব্যবহারই মানুষ প্রথম শুরু করে। যদিও এই সোনা দিয়ে কোনো অস্ত্র বা কাজের যন্ত্রপাতি তৈরি করা যেত না। খ্রীস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগেই মানুষ এর ব্যবহার শুরু করে। প্রাচীন মিশর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মেনেস (Menes) তাঁর আমলে নিজ নামে চৌদ্দ গ্রাম ওজনের স্বর্ণপিণ্ডকে দ্রব্যমূল্যের একক হিসেবে প্রচলন করেন। অরোরা (Aurora—উষা দেবী) শব্দ থেকেই এই ধাতুটির অরিয়াম (Aurium) নামের উৎপত্তি।

banglainternet.com

সোনা বিরল ধাতু। প্রকৃতিতে এই ধাতু সাধারণত মৌলিক অবস্থায়, সিলভারের সাথে মিশ্রণ হিসেবে, আবার ক্যালাভেরাইট (Calaverite) ও সিলভানাইট (Sylvanite) যৌগ হিসেবে পাওয়া যায়। শিলামণ্ডলে ও ভূত্বকে এর পরিমাণ ৫×১০^{-৭}%, আর লৌহ-উল্কাপিণ্ডে $১·৮\times১০^{-৪}$%।

সোনা অভিজাত ধাতু। এর গলনাঙ্ক ১০৬৩° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২৬০০° সে.। সোনা খুব নমনীয় ধাতু। এক গ্রাম সোনাকে দুই হাজার মিটার লম্বা তারে পরিণত করা সম্ভব। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রায় নিষ্ক্রিয় এবং ধাতুটির বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। বিশুদ্ধ সোনা খুব নরম বলে প্রধানত তামা কিংবা রুপার সঙ্গে তৈরি এর সংকর ধাতু ব্যবহার করা হয়। এই সংকর ধাতুতে সোনার পরিমাণ সহস্রাংশে অথবা ক্যারাট-এ (দুই রতি) হিসেব করা হয়। ২৪ ক্যারাট বিশুদ্ধ সোনাকে প্রকাশ করে। ১৮ ক্যারাট সংকর ধাতুতে ২৪ ভাগের ১৮ ভাগ থাকে বিশুদ্ধ সোনা। সোনার সংকর ধাতুই অলঙ্কার ও মুদ্রা তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

পারদ (Hg), Z=৮০

খ্রীস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগের মিশরের সমাধি মন্দিরে পারদ (Mercury) পাওয়া গেছে। প্রাচীন চীন ও ভারতে পারদ পরিচিত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকে খনি থেকে সোনা নিষ্কাশনের জন্য পারদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মেক্সিকোতে সিলভার আকরিকে অ্যামালগামেশন পদ্ধতি ব্যবহার শুরু হয়। বিশেষ করে আলকেমিস্টরা পারদের খুব গুরুত্ব দিয়েছিল। সকল ধাতুর সাধারণ উপাদান হিসেবে তারা পারদকে জানত। কেবল পারদের পরিমাণ পরিবর্তন করেই একটি ধাতুকে অন্য ধাতুতে রূপান্তরিত করা যেতে বলে তাদের ধারণা ছিল। Hydrargyrum (তরল সিলভার) শব্দ থেকে এই ধাতুটির সঙ্কেত Hg-এর উৎপত্তি।

banglainternet.com

পারদ বিরল ধাতু। কখনো কখনো একে মৌলিক অবস্থায় দেখা যায়। প্রধানত সিনাবার (Cinnabar) নামক খনিজ মারকিউরি সালফাইড থেকে পারদ পাওয়া যায়। ভূত্বকে এর পরিমাণ হলো ৬×১০^{-৬}%, আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে $১০^{-৬}$%। এ পর্যন্ত ধাতুটির বিশটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সন্ধান মিলেছে।

সাধারণ তাপমাত্রায় ধাতুটি রুপালি সাদা বর্ণের উজ্জ্বল তরল অবস্থায় থাকে। ইলেকট্রো-ক্যামিস্ট্রিতে পারদ খুব প্রয়োজনীয়। কিছু কিছু রি-অ্যাকটরে হিমায়ক হিসেবে, সোনা ও সিলভার ধাতুবিদ্যায়, জৈব রসায়নে অনুঘটক হিসেবে এই ধাতুটি ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে সংমিশ্রণে পারদ সংকর ধাতু বা অ্যামালগাম তৈরি করে। ফিউজড্ স্ফটিক টিউবে পারদ পুরে মারকিউরিক আর্ক ল্যাম্প তৈরি করা হয়। এর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে পারদ বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে নীলাভ সবুজ তীব্র আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত করে। পারদ এবং এর যৌগ খুব বিষাক্ত।

থেলিয়াম (Tl), Z=৮১

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্রুক্স সালফিউরিক এসিড কারখানার সীসক চেম্বারের তলানি বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন। ধাতুটির বৈশিষ্ট্যমূলক (গ্রীক শব্দ thallos—অর্থাৎ সবুজ ডালা) সুন্দর সবুজ বর্ণালী রেখার জন্য একে থেলিয়াম (Thallium) নামকরণ করা হয়।

প্রকৃতিতে থেলিয়াম ব্যাপকভাবে কিন্তু অল্প পরিমাণে বিস্তৃত রয়েছে। একে সাধারণত জিংক, কপার ও লোহার ব্লেণ্ডে ও পিরাইটে দেখা যায়। আকরিক হিসেবে ক্রোকেসাইট (Crookesite) ও বেরজেলিয়েনাইট (Berzelianite) উল্লেখযোগ্য। ভূত্বকে এর পরিমাণ $১০^{-৫}$%।

এ পর্যন্ত থেলিয়ামের সতেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পরিচিত হয়েছে। এর গলনাঙ্ক ৩০২° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ১১৮৫° সে.।

থেলিয়াম বিরল, নরম, নমনীয় ধাতু। এর লবণসমূহ বিষাক্ত। সীসা ও অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে সঙ্কর ধাতু তৈরি করে। চশমার কাচ নির্মানে এবং পরীক্ষাগারে সমতরঙ্গী একবর্ণী সবুজ আলোর উৎস হিসেবে থেলিয়াম ব্যবহার করা হয়।

banglainternet.com

সীসা (Pb), Z=৮২

মানুষের ব্যবহৃত প্রাচীনতম ধাতুসমূহের অন্যতম সীসা। প্রাচীন মিশরে এটি পরিচিত ছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাচীনকালে টিন থেকে এই ধাতুটিকে সঠিক করে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যেত না। পুনিক

যুদ্ধের (Punic Wars) সময় স্পেনে অনেক ধরনের সীসার খনির সন্ধান মেলে। পরবর্তীতে রোমবাসীরা এই খনিগুলি থেকে সীসা নিষ্কাশন করে প্রধানত পানির পাইপ তৈরিতে ব্যবহার করত।

প্রকৃতিতে সীসার সবচেয়ে বিস্তৃত আকরিক হলো গ্যালেনা (Galena)। অন্যান্য আকরিকের মধ্যে সেরুসাইট (Cerussite), অ্যাঙ্গলেসাইট (Anglesite), ক্রোকোয়াইট (Crocoite), উল্‌ফেনাইট (Wulfenite) উল্লেখযোগ্য। ভূত্বকে এর পরিমাণ $১·৬ \times ১০^{-৩}$%, আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ও লৌহ-উল্কাপিণ্ডে যথাক্রমে ২×১০^{-৪} ও ৬×১০^{-৩}%। প্রাকৃতিক সীসাতে চারটি আইসোটোপ লক্ষনীয়।

সীসা খুব ভারি ধাতু। এর গলনাঙ্ক ৩২৭·৪° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ১৭৪০° সে.।

সীসা খুব নরম ও নমনীয়, খুব কম প্রসারণীয় ও সফলভাবে বিদ্যুৎ পরিবাহী। এটি বহু সংকর ধাতুর একটি উপাদান। তড়িৎবাহী তারের আবরণ হিসেবে, গবেষণাগারের লাইনিং হিসেবে, ইলেকট্রোলাইটিক সেলে, সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত প্রকোষ্ঠতে ও স্টোরেজ ব্যাটারির প্লেটে সীসা ব্যবহৃত হয়। সীসার যৌগসমূহ (সবই বিষ) রঞ্জক হিসেবে, কাচ তৈরিতে, পেট্রোলে, তৈল ঘনীভূতকরণে এবং গৃহাদি নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হয়। সীসা বিকিরণ শোষক এবং সে জন্যে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটর রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ও অ্যাকটিনিয়াম এই তিনটি তেজস্ক্রিয় বিভাজন পর্যায়ের মূল পদার্থের বিভাজন শেষে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সীসার একটি ভিন্ন স্থায়ী আইসোটোপ সৃষ্ট হয়। তেজস্ক্রিয় বিভাজনের হার একই রূপ থাকায় কোনো শিলার আদি বস্তুতে সীসার অনুপাত নির্ণয় করতে পারলেই ঐ শিলার বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব।

banglainternet.com

বিসমাথ (Bi) Z=৮৩

সম্ভবত এই সহস্র বছরের শুরুতে কিংবা তারও আগে বিসমাথ (Bismuth) পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তখন এই ধাতুটিকে টিন অথবা সীসার রূপান্তর কিংবা এদের মিশ্রণ হিসেবে গণ্য করা হতো। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী অ্যাগরিকল এবং পরবর্তীতে অন্যান্য গবেষকদের বিসমাথকে বিশুদ্ধ ধাতু হিসেবে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও আরও দুশো বছর পূর্ববর্তী এই ভুল ধারণাই বিদ্যমান

ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেও এই ধাতুটিকে পারদ, আর্সেনিক, সালফার ও মাটির মিশ্রণ বলে ধরে নেয়া হতো। এই ধাতুটির নামকরণের সঠিক ইতিহাস এখনও জানা যায় নি। তবে অনেক সময় একে আরবী শব্দ Wiss Majaht (সহজে গলনীয়) বা জার্মান শব্দ Wiss Mat (আদা পিণ্ড)-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে ধারণা করা হয়।

বিসমাথ খুব বিরল ধাতু, প্রধানত মৌলিক অবস্থায় দেখা যায় তবে সালফাইড ও অক্সাইড হিসেবেও প্রকৃতিতে একে পাওয়া যায়। শিলামণ্ডলে এর পরিমাণ ২×১০^{-৫}%, আর ভূত্বকে মাত্র $১০^{-৫}$%। এ পর্যন্ত বিসমাথের বিশটিরও বেশি কৃত্রিম আইসোটোপ পাওয়া গেছে।

বিসমাথের গলনাঙ্ক ২৭১° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ১৫০৬° সে.। বহু নিম্ন গলনাঙ্কবিশিষ্ট সংকর ধাতুর এটি একটি উপাদান। ম্যাঙ্গানিজের সঙ্গে তৈরি বিসমাথের সংকর ধাতু স্থির চুম্বক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গলনাঙ্কের নিম্নমানের জন্য ধাতুটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরের হিমায়ক হিসেবে কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিসমাথের কিছু কিছু যৌগ ওষুধ শিল্পের প্রয়োজন মেটায়।

পলোনিয়াম (Po), Z=৮৪

ইউরেনিয়ামের আকরিক পিচব্লেণ্ড নিয়ে বহু গবেষণার পর বিজ্ঞানী পিয়ার ও মারী কুরী ১৮৯৮ সালে এই ধাতুটির ^{২১০}Po আইসোটোপটি আবিষ্কার করেন। মারী কুরীর জন্মভূমি পোলেণ্ডের নামানুসারেই ধাতুটিকে পলোনিয়াম (Polonium) নামকরণ করা হয়। তেজস্ক্রিয়তা ভিত্তিক আবিষ্কৃত মৌলগুলির মধ্যে এটিই প্রথম মৌল। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ছয়টি আইসোটোপ ছাড়াও পলোনিয়ামের প্রায় বিশটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা গেছে।

পলোনিয়াম খুব বিষাক্ত ধাতু। এর গলনাঙ্ক ২২৫° সে আর স্ফুটনাঙ্ক ৯৬২° সে। বিচ্ছুরণ ও আয়নায়নের উৎস হিসেবে পলোনিয়ামের নানাবিধ ব্যবহার লক্ষণীয়। ^{২১০}Po এর সাহায্যেই ১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী চাডউইক (Chadwick) নিউট্রন আবিষ্কার করেন এবং ১৯৩৪ সালে বিজ্ঞানী আইরিন কুরী (Irene Curie) ও জোলিও (Joliot) কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন। আলফা বিচ্ছুরণের উৎস হিসেবে বিকিরণ-জীববিদ্যায়

banglainternet.com

ও বিকিরণ-রাসায়নে, গ্যাসীয় বিশ্লেষকে, উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে পলোনিয়ামের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

রেডিয়াম (Ra), Z=৮৮

১৮৯৮ সালে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী পিয়ারে ও মারী কুরী ইউরেনিয়াম রেজিনে এই তেজস্ক্রিয় ধাতুটির আইসোটোপ আবিষ্কার করেন। এ পর্যন্ত প্রায় সতেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেছে। ১৯১০ সালে মারী কুরী মার্কারী ক্যাথডে এই ধাতুটির ক্লোরাইডকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে ধাতুটিকে পৃথক করতে সক্ষম হন। রেডিয়াম উজ্জ্বল সাদা রঙের, গলনাঙ্ক ৭০০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক~১১৪০° সে.। প্রায় সকল ইউরেনিয়ামের আকরিকে রেডিয়াম উপস্থিত থাকে। বহুকাল যাবত রেডিয়ামই ছিল একমাত্র তেজস্ক্রিয় মৌল যা রশ্মি বিকিরণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো। তখন শিল্পক্ষেত্রে ইউরেনিয়ামের আকরিক থেকে ইউরেনিয়ামকে পৃথক করে রেডিয়ামকে নিষ্কাশন করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে রেডিয়ামের পরিবর্তে কৃত্রিম গামা-বিচ্ছুরণ ব্যবহার করা হচ্ছে বলে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনে রেডিয়ামকে কেবল উপজাত হিসেবেই ধরা হয়।

অ্যাকটিনিয়াম (Ac), Z=৮৯

১৮৯৯ সালে বিজ্ঞানী ডেবের্ন (Debierne) ইউরেনিয়ামের আকরিকে এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন। গ্রীক শব্দ aktinos অর্থাৎ রশ্মি থেকে এই ধাতুটিকে অ্যাকটিনিয়াম (Actinium) নামকরণ করা হয়। ইউরেনিয়ামের আকরিকে অ্যাকটিনিয়ামকে খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক খনির তুলনায় কৃত্রিম উপায়ে নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় অ্যাকটিনিয়াম ধাতুটিকে তৈরি করা সহজ। বিজ্ঞানী হ্যাগেম্যান ১ গ্রাম রেডিয়াম থেকে ১·৩ মিলিগ্রাম বিশুদ্ধ অ্যাকটিনিয়াম প্রস্তুত করেন। সর্বমোট ১৬টি আইসোটোপ পাওয়া গেছে। সবকটি আইসোটোপই তেজস্ক্রিয়। ধাতুটির গলনাঙ্ক ১০৫০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩৩০০° সে.। এটি অ্যাকটানাইড শ্রেণীর (Z=৮৯—১০৩) প্রথম সদস্য।

banglainternet.com

থোরিয়াম (Th), Z=৯০

১৮২৮ সালে বিজ্ঞানী বেরজেলিয়াস অক্সাইডরূপে থোরিয়ামকে আবিষ্কার করেন। স্কান্ডিনেভিয়ার উপকথা বজ্রধ্বনির দেবতা Thor-এর নামানুসারে এই ধাতুটিকে থোরিয়াম (Thorium) নামকরণ করা হয়।

প্রকৃতিতে প্রধানত মোনাজাইট (Monazite) ও থোরাইট (Thorite) আকরিকে থোরিয়াম পাওয়া যায়। এছাড়াও ল্যান্থানাম ও জার্কোনিয়ামের আকরিকে কিছু পরিমাণ থোরিয়াম দেখা যায়। ভূত্বকে ও শিলামণ্ডলে ইউরেনিয়ামের তুলনায় থোরিয়ামের পরিমাণ তিন গুণ বেশি ($\sim 10^{-3}$%)। পাথুরে উল্কাপিণ্ডে এর পরিমাণ 8×10^{-6}%। প্রাকৃতিক থোরিয়াম দুইটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের মিশ্রণ। থোরিয়ামের সর্বমোট সাতটি কৃত্রিম আইসোটোপ পাওয়া গেছে।

থোরিয়ামের গলনাঙ্ক ১৭৫০° সে.। ধাতুটি পারমাণবিক শক্তির অন্যতম উৎস। এর কিছু কিছু লবণ ওষুধে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বেশ কিছু পরিমাণ থোরিয়াম অক্সাইড ফিশার-ট্রপস বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কৃত্রিম তৈল প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়।

প্রোট্যাকটিনিয়াম (Pa), Z=৯১

মৌলটির ^{234}Pa আইসোটোপটি সর্বপ্রথম ১৯১৩ সালে বিজ্ঞানী ক্যাসিন্স ও গোহরিং আবিষ্কার করেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ ^{231}Pa আইসোটোপটি বিজ্ঞানী অটোহ্যান ও মেইটনের এবং সোডি ও ক্রেনস্টোন পৃথকভাবে ১৯১৮ সালে ইউরেনিয়াম রেজিন থেকে আবিষ্কার করেন। হ্যান ও মেইটনের এর নামকরণ করেন প্রোট্যাকটিনিয়াম (Protactinium)। একে অ্যাকটিনিয়াম ধাতুর অগ্রদূত বলা হয়। ক্লোরাইডকে বিজারিত করে খুব অল্প পরিমাণে মূল ধাতু প্রোট্যাকটিনিয়াম পাওয়া যায়। এক গ্রাম বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের মূল আকরিক থেকে 3.1×10^{-7} গ্রাম প্রোট্যাকটিনিয়াম পাওয়া যায়। উল্কাপিণ্ডে এর পরিমাণ 2×10^{-8}%।

ইউরেনিয়াম (U), Z=৯২

১৭৮৯ সালে বিজ্ঞানী ক্লাপ্রথ পিচব্লেন্ডে (Pitchblende) ডাই অক্সাইড রূপে এই তেজস্ক্রিয় ধাতুটি আবিষ্কার করেন। এর অল্প কয়েক বছর আগে

(১৭৮১ সালে) হেরশেল (Herschel) কর্তৃক আবিষ্কৃত ইউরেনাস গ্রহের নামানুসারে ক্লাপ্রথ এই ধাতুটিকে ইউরেনিয়াম (Uranium) নামকরণ করেন। বিজ্ঞানী পেলিগো (Peligot) ১৮৪১ সালে এই ধাতুটিকে পৃথক না-করা পর্যন্ত ক্লাপ্রথের ঐ ডাই অক্সাইডকেই মূল ধাতু হিসেবে গণ্য করা হতো। ১৮৯৬ সালে বিজ্ঞানী বেকেরাল (Becquerel) এই ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন।

ইউরেনিয়াম খুব বিরল ধাতু। এর প্রধান আকরিক হলো পিচব্লেণ্ড, কারনোটাইট (Carnotite) ও ইউরেনাইট (Uranite)। শিলামণ্ডলে এর পরিমাণ ৪×১০^{-৪}%, ধাতুটি নিয়োডিয়ামের তুলনায় প্রায় দশ গুণ কম তবে পারদের তুলনায় বিশগুণ বেশি। পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ ৪×১০^{-৫}%, তবে লৌহ উল্কাপিণ্ডে এর উপস্থিতি দেখা যায় না। এর গলনাঙ্ক ১১৩৩° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৩৯০০° সে.।

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম হলো তিনটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সমষ্টি। ইউরেনিয়ামের ২৩৮ ভরসংখ্যাবিশিষ্ট আইসোটোপের ক্রমভাঙনের ফলে রেডিয়াম পাওয়া যায়। ক্রমভাঙনের শেষ পর্যায়ে সীসা উৎপন্ন হয়। তদুপরি এই আইসোটোপটি ব্যবহার করে প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন করা যায়। যে ইউরেনিয়ামের ভরসংখ্যা ২৩৫ তার নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে পারমাণবিক তেজ মুক্তি করে। তাই বর্তমানে পারমাণবিক শক্তির যুগে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরে পারমাণবিক শক্তির মূল উৎস হিসেবে ইউরেনিয়াম অন্যতম ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

banglainternet.com

ধাতু ও অধাতু

বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার সম্বন্ধে জানতে চাইলে অবশ্যই কৃত্রিম মৌলগুলির কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। চল্লিশ বছরের কম সময়ে আঠারোটি মৌল (সতেরোটি ধাতু আর একটি অধাতু) বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করেছেন। সাধারণত সংশ্লেষণ বলতে সরল থেকে জটিল তৈরি করার পদ্ধতিকেই বুঝায়। যেমন সালফার ও অক্সিজেনের বিক্রিয়াই হচ্ছে সালফার ডাই অক্সাইডের রাসায়নিক সংশ্লেষণ। 'মৌল সংশ্লেষণ' বলতে নিম্নমানের পরমাণু সংখ্যাবিশিষ্ট কোনো মৌল থেকে উচ্চ পরমাণু সংখ্যাবিশিষ্ট কোনো মৌল তৈরি করাই আমরা বুঝাবো। আর এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় নিউক্লীয় বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় কোনো মৌলের নিউক্লিয়াসকে আলফা কণা, নিউট্রন, প্রোটন বা ডিউটেরন দ্বারা কিংবা কোনো কোনো মৌলের, যেমন বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, নিয়ন, আরগন ইত্যাদির ভারি আয়ন দ্বারা আঘাত করলে এই কণা ঐ নিউক্লিয়াসের সাথে একত্রিত হয়ে যায়। যেহেতু নিউট্রন ছাড়া উল্লিখিত সকল কণাই ধনাত্মক চার্জ বহন করে ফলে নিউক্লিয়াসের সাথে একত্রিত হলে শুধু চার্জই বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এর মান বৃদ্ধি পায় এবং নতুন মৌলের সৃষ্টি হয়। এটি হলো নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় 'মৌল সংশ্লেষণ'।

এই পদ্ধতি অবলম্বনে রাসায়নবিদ্‌রা পর্যায় সারণীর আঠারোটি স্থান পূর্ণ করতে সক্ষম হন। হাইড্রোজেন থেকে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত চারটি ($Z=৪৩$, ৬১, ৮৫, ৮৭) এবং ইউরেনিয়ামের পরবর্তী চৌদ্দটি ($Z=৯৩—১০৬$) ট্রান্সইউরেনিক (Transuranic) মৌলসমূহ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়।

banglainternet.com

টেক্‌নিশিয়াম (Tc), $Z=৪৩$

১৯২৫ সালে বিজ্ঞানী নোড্ডাক (Noddack) ও টাক্‌কে (Tacke) রিনিয়াম আবিষ্কারের সময় এই ৪৩ পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটিও আবিষ্কার করে বলে ধারণা করেন এবং এর ম্যাসুরিয়াম নামকরণ

করেন। অবশ্য এই মৌলটি আবিষ্কারের পক্ষে তাঁদের যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না। পরবর্তীতে ১৯৩৭ সালে বিজ্ঞানী সেগরে (Segre) নিউক্লীয় বিক্রিয়ার সাহায্যে, মলিবডেনামকে ডিউটেরন দ্বারা আঘাত করে এই মৌলটিকে উৎপাদন করে এর মৌলিক গুণাবলীর উপর গবেষণা করেন। এই মৌলটিকে সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করা হয় বলে গ্রীক শব্দ 'Technetors – কৃত্রিম' থেকে এর নামকরণ টেক্‌নিশিয়াম (Technetium) করা হয়। এই মৌলটি খুব অস্থির। পরবর্তীতে এই টেক্‌নিশিয়ামের আরও কয়েকটি কৃত্রিম আইসোটোপ পাওয়া যায় তবে এরাও ছিল অস্থির (unstable)। ১৯৪৭ সালে বিজ্ঞানী সেগরে ইউরেনিয়াম বিভাজনের ফলে উৎপন্ন পদার্থে সর্বোচ্চ দীর্ঘ জীবনসম্পন্ন টেক্‌নিশিয়ামের আইসোটোপ (^{99}Tc) পান। এর অর্ধায়ু ছিল প্রায় ২×১০^5 বছর (তেজ-স্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুগুলি স্বতঃপরিবর্তনশীল। এদের বিঘটন প্রক্রিয়া [disintegration] একটি বিশেষ হারে সংঘটিত হয়। বিঘটন প্রক্রিয়ার কোনো পদার্থের অর্ধেক ক্ষয় হতে যে সময়ের প্রয়োজন তাকে পদার্থটির অর্ধায়ু বা Half life বলা হয়)। আর আমাদের পৃথিবীর বয়স প্রায় ১০,০০০ গুণ বেশি। সুতরাং পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতে কোনো টেক্‌নিশিয়াম উৎপন্ন হয়ে থাকলে তা আজ নিঃশেষে হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। ১৯৫৬ সালে বিজ্ঞানী পার্কার (Parker) ও কুরোডা (Kuroda) প্রমাণ করেন যে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ৬৭ বছর অর্ধায়ুসম্পন্ন কিন্তু তেজস্ক্রিয় মলিবডেনাম আইসোটোপ (^{99}Mo) উৎপন্ন করে যা পরবর্তীতে বিটা বিকিরণের ফলে টেক্‌নিশিয়ামে (^{99}Tc) রূপান্তরিত হয়। এটা প্রমাণ করে যে ইউরেনিয়াম থেকে অনবরত মলিবডেনাম (^{99}Mo) তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রকৃতিতে এই তেজস্ক্রিয় মলিবডেনাম থেকে অনবরত টেক্‌নিশিয়ামও তৈরি হচ্ছে। অবশ্য আজ পর্যন্ত এই প্রক্রি-য়ায় উৎপন্ন প্রাকৃতিক টেক্‌নিশিয়াম নিরূপণ করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

banglainternet.com

প্রমেথিয়াম (Pm), Z=৬১

বিরল মৃত্তিকার আকরিকে দীর্ঘকালের অসফল গবেষণার পর ১৯৪২ সালে বিজ্ঞানী ল (law), পোল (Pool) ও কুইল (Quill) সাইক্লোট্রোনে

নিওডিমিয়ামের নিউক্লিয়াসকে ডিউটেরন দ্বারা আঘাত করে সর্বপ্রথম এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন। ১৯৪৫ সালে বিজ্ঞানী কোরিয়েল (Coryell), মারিন্‌স্কি (Marinsky) ও গ্লেনডেনিন (Glendenin) ইউরেনিয়ামের বিভাজনের ফলপ্রসূ হিসেবে প্রমোথিয়ামের দুটি তেজস্ক্রিয় (^{147}Pm ও ^{149}Pm) আইসোটোপ পৃথক করতে সক্ষম হন। গ্রীক ধর্মে উল্লিখিত প্রোমেথিউস, যিনি মানুষকে অগ্নি ও কলাবিদ্যা প্রদান করেন, তার সম্মানে কোরিয়েল এই মৌলটিকে প্রোমেথিয়াম (Promethium) নামকরণ করেন। অবশ্য বর্তমানে এই ধাতুটির প্রায় ১৪টি আইসোটোপ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এরা সবাই তেজস্ক্রিয়। ১৮ বছরে অর্ধায়ুসম্পন্ন সবচেয়ে দীর্ঘজীবী আইসোটোপ হল ^{145}Pm।

অ্যাসটেটিন (Ac), Z=৮৫

এটি অধাতু। মৌলটির প্রথম আইসোটোপটি বিজ্ঞানী সেগরে (Segre), ১৯৪০ সালে বিসমাথকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন আলফা-কণা দ্বারা আঘাত করে তৈরি করেন (^{211} Pm)। এটি তেজস্ক্রিয়, অর্ধায়ু মাত্র ৭·২ ঘণ্টা। গ্রীক শব্দ astatos (অস্থির) থেকে এর অ্যাসটেটিন (Astatine) নামকরণ করা হয়। এ পর্যন্ত আরো বাইশটি আইসোটোপ পরিচিত হয়েছে। এই মৌলটি আয়োডিনের সমরূপ।

ফ্রানসিয়াম (Fr), Z=৮৭

বহুকালের অনুসন্ধান ও গবেষণার পর এই অজ্ঞাত মৌলটি আবিষ্কার সম্ভব হয়। ফরাসী বিজ্ঞানী পেরে (Perey) ১৯৩৯ সালে প্রমাণ করলেন যে অ্যাকটিনিয়ামের বিভাজনের ফলে পরমাণুর ১·২% ভাগ আলফা-কণা বিচ্ছুরণ করে এবং বাকি সব বিটা বিচ্ছুরণ করে। এই আলফা বিচ্ছুরণের ফলেই অ্যাকটিনিয়াম ^{223}Fr তেজস্ক্রিয় মৌলে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে পেরের মাতৃভূমি ফ্রান্সের নামানুসারে এই ধাতুটিকে ফ্রানসিয়াম (Francium) নামকরণ করা হয়। এই তেজস্ক্রিয় ধাতুটির অর্ধায়ু মাত্র বাইশ মিনিট। এটিই প্রমাণ করে যে প্রকৃতিতে ফ্রানসিয়াম কেন এত কম। অবশ্য ফ্রানসিয়াম কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করাই সহজ। তাই এটি কৃত্রিম ধাতুরই অন্তর্গত। এ পর্যন্ত প্রায় বিশটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা

banglainternet.com

সম্ভব হয়েছে। তবে ^{২২৩}Fr-ই হলো দীর্ঘায়ুসম্পন্ন আইসোটোপ। সকল ধাতুর মধ্যে ফ্রানসিয়ামই হলো সর্বাপেক্ষা ইলেকট্রোপজিটিভ। অ্যাকটিনিয়াম নিরূপণ এর একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ট্রান্সইউরেনিক (Transuranic) ধাতুসমূহ ($Z=৯৩-১০৬$)

ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারি ধাতু প্রকৃতিতে খুঁজে পেতে অনেক গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু প্রতিবারই নিরাশ হয়েছেন গবেষণার ফলাফল নিয়ে। তবে কৃত্রিম উপায়ে এই ধাতুগুলি পাবার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁরা এক অসাধারণ ভুল করে বসেন। সাধারণত নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের আঘাতে অপেক্ষাকৃত ভারি মৌলের জন্ম নেয়ার কথা। এর ভিত্তিতে ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে তাঁরা একটি নয় বরঞ্চ কয়েকটি নতুন মৌল পেয়েছেন বলে প্রথমে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। এমনকি ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারি পাঁচটি ধাতুর প্রাপ্তি সংবাদও প্রকাশিত হলো। পরবর্তীতে দেখা গেল যে কোনো ট্রান্সইউরেনিক মৌল নয় বরঞ্চ সৃষ্টি হয়েছে তেজস্ক্রিয় বেরিয়াম ও ল্যান্থানাম। এছাড়াও লক্ষ্য করা গেল যে এমন কিছু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি হচ্ছে যাদের অস্তিত্ব প্রকৃতিতে নেই এবং এরা সবাই ইউরেনিয়ামের চেয়ে হালকা। পরবর্তীতে প্রমাণিত হলো যে ^{২৩৫}U কে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে এর নিউক্লিয়াস বিভাজনের ফলে কেবল নিম্নমানের ভরের নিউক্লিয়াসই তৈরি হয় না, পাশাপাশি দুই-তিনটা নিউট্রনও ছিটকে পড়ে এবং এই নিউট্রনগুলিই পরে আবার নিউট্রনকে ভাঙার কাজে অংশ নেয়। আর এই প্রতিবারের বিভাজনের ফলেই প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তিকেই পরবর্তীতে মানুষ পারমাণবিক শক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে শেখে।

^{২৩৮}U-কে নিউট্রন দ্বারা আঘাতের ফলে গঠিত পদার্থসমূহের মধ্যে পরিশেষে ১৯৪০ সালে বিজ্ঞানী ম্যাকমিল্লান (Memillan) ৯৩ পারমাণবিক সংখ্যার ট্রান্সইউরেনিক মৌলটির সন্ধান পান। রাসায়নিক ধর্মের দিক দিক দিয়ে এটি ইউরেনিয়ামের সমরূপ। রিনিয়ামের সাথে আকাঙ্ক্ষিত কোনো সাদৃশ্য নেই তার। এই কৃত্রিম মৌলটিকে নেপচুন গ্রহের নামানুসারে নেপচুনিয়াম (Neptunium) নামকরণ করা হয়। এর রাসায়নিক সঙ্কেত Np।

banglainternet.com

একই বছর বিজ্ঞানী ম্যাকমিল্লান ইউরেনিয়ামকে ডিউটেরন দ্বারা আঘাত করে পরবর্তী মৌলটি প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। নেপচুনের পার্শ্ববর্তী গ্রহ প্লুটোর নামানুসারে এই মৌলটিকে প্লুটোনিয়াম (Plutonium) নামকরণ করা হয় (Pu, Z=৯৪)। ^{২৩৯}Pu ও ^{২৪১}Pu-কে অত্যন্ত গতিশীল আয়ন দ্বারা আঘাত করে কিংবা রিঅ্যাক্টরে বহুকাল ধরে নিউট্রনের তীব্র ফ্লাক্সের প্রভাবে রেখে অপেক্ষাকৃত ভারি ট্রান্সইউরেনিক মৌল সংশ্লেষণ করা যায়। এটিই একমাত্র ট্রান্সইউরেনিক মৌল যা পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়। ^{২৩৫}U-এর মতো এটিও নিউট্রনের প্রভাবে বিভাজিত হয়ে পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৯৪৪ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী সিবর্গ (Seaborg), জেমস (James), জিওরসো (Ghiorso) ও মোরগান (Morgan) ^{২৩৯}Pu-কে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে পরবর্তী ট্রান্সইউরেনিক মৌলটি (Z=৯৫, Am) আবিষ্কার করেন এবং মাতৃভূমির সম্মানে মৌলটিকে আমেরিকিয়াম (Americium) নামকরণ করেন।

একই বছর এই বিজ্ঞানীরা ^{২৩৯}Pu-কে দ্রুতগতিসম্পন্ন আলফা-কণা দ্বারা আঘাত করে ৯৬ পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটি প্রস্তুত করেন। এবং মারী কুরীর সম্মানে এর নামকরণ করেন কিউরিয়াম (Curium)। এর রাসায়নিক সঙ্কেত Cm।

পরবর্তী মৌলটির আইসোটোপ ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানী টমসন, জিওরসো ও সিবর্গ আবিষ্কার করেন। প্লুটোনিয়ামকে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের ভিতর নিউট্রনের প্রভাবে প্রায় ছয় বছর রাখার পর মাত্র কয়েক মাইক্রোগ্রাম তৈরি হয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার বারকলি শহরে এই মৌলটি আবিষ্কৃত হয় বলে একে বার্কেলিয়াম (Berkelium) নামকরণ করা হয়। এ পর্যন্ত বার্কেলিয়ামের (Bk) প্রায় সতেরটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

কিউরিয়ামকে আলফা-কণা দ্বারা আঘাত করে বিজ্ঞানী টমসন, স্ট্রীট, জিওরসো ও সিবর্গ ক্যালিফোর্নিয়াম (Cf, Z=৯৮) আবিষ্কার করেন। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ও বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে এই মৌলটি আবিষ্কৃত হয় তাদের নামানুসারেই একে ক্যালিফোর্নিয়াম (Californium) নামকরণ করা হয়।

পরবর্তী ট্রান্সইউরেনিক মৌল দুটির ($Z=৯৯$, ১০০) আবিষ্কারের ইতিহাস খুব মনোরঞ্জক। সর্বপ্রথম ১৯৫২-১৯৫৩ সালে এই মৌলগুলিকে পাওয়া যায়। থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে কি সৃষ্টি হয়—এ নিয়ে গবেষণার জন্য উড়োজাহাজ নিয়ে গর্জনশীল মেঘের ভিতর দিয়ে উড়ে কিছু অধঃক্ষেপ সংগ্রহ করা হয়। এই অধঃক্ষেপেই দুটি নতুন মৌলের সন্ধান মিলে। সঠিক ফলাফলের জন্য বজ্রপাতের ফলে পরিবর্তিত মাটি ও আকরিক সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে এই দুইটি মৌলকে নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন (Einstein) ও ফারমির (Fermi) সম্মানে প্রথমটিকে আইনস্টানিয়াম (Einsteinium) ও দ্বিতীয়টিকে ফারমিয়াম (Fermium) নামকরণ করা হয়। বর্তমানে আইনস্টানিয়াম (Es, $Z=৯৯$) ও ফারমিয়াম (Fm, $Z=১০০$) পরীক্ষাগারে তৈরি হচ্ছে।

১০১ পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটি (Md) সংশ্লেষণের জন্য বিজ্ঞানীদের কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। কেননা পরীক্ষাগারে ব্যবহারের জন্য তৈরি আইনস্টানিয়ামের পরিমাণ ছিল খুবই কম। ১৯৫৫ সালের দিকে যখন বেশ কিছু পরিমাণ জমা হলো বিজ্ঞানী জিওরসো, হারবি, চপিন ও সিবর্গ স্বর্ণের পাতে আইনস্টানিয়ামের (এক মিলিগ্রামের শতকোটি ভাগের চেয়েও কম) আবরন তৈরি করে অপর পার্শ্ব থেকে আলফা-কণা দ্বারা আঘাত করে নতুন মৌল তৈরি করেন। নতুন মৌলের প্রতিটি কণা ছিটকে পড়ে পার্শ্ববর্তী স্বর্ণের পাতে গিয়ে জমা হল। এই পদ্ধতিতেই ১০১ পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটি বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা সম্ভব হয়। মৌলটিকে বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিয়েভের নামানুসারে মেণ্ডেলিভিয়াম (Mendelevium) নামকরণ করা হয়।

১০২ পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটির আবিষ্কার সম্বন্ধে স্টকহোমের নবেল ইনস্টিটিউটে গবেষণারত একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী দল ১৯৫৭ সালে ঘোষণা করেন। কিউরিয়ামের নিউক্লিয়াসকে ^{13}C আয়ন দিয়ে আঘাত করে গবেষকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে তাঁরা ১০২ পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটির আইসোটোপ আবিষ্কার করেছেন। এবং ডিনামাইট আবিষ্কারক বিজ্ঞানী নোবেলের নামানুসারে নোবেলিয়াম (Nobelium) নামকরণ করেন। প্রায় এক বছর পর সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা আলাদাভাবে একই পরীক্ষা চালিয়ে স্টকহোমের গবেষকদের মতো কোনো ফলাফল

banglainternet.com

পেলেন না।—পরবর্তীতে কারো পক্ষে এই বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় নোবেলিয়াম পুনরুৎপাদন করা সম্ভব হয় নি। এই ঘটনাটির পরিণতি ঘটে দুঃখজনক চুটকিতে। Nobelium শব্দ থেকে কেবল সংকেত হিসেবে No (না)-ই থেকে যায়। তবে ১৯৬২-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কয়েকজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী এই মৌলটির কয়েকটি আইসোটোপ সংশ্লেষণ করেন এবং ধর্মাবলী নিয়েও গবেষণা করেন। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের এই ফলাফলের সত্যতা স্বীকার করেন। তবে সংকেত No আবিষ্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত না-হয়েও ঐ অবস্থায়ই থেকে যায়।

১৯৬১ সালে আমেরিকার বারক্‌লির রেডিয়েশন পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানী জিওরসো ও তাঁর সহকর্মীরা ক্যালিফোর্নিয়ামকে বোরনের আয়ন দ্বারা আঘাত করে ১০৩ পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটি (Lw) আবিষ্কার করেন এবং বিজ্ঞানী লরেন্সের নামানুসারে একে লরেন্সিয়াম (Lowrencium) নামকরণ করেন।

১৯৬৪ সালে কয়েকজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী ^{242}Pu-কে নিয়নের আয়ন দ্বারা আঘাত করে ১০৪ পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটি (Ku) তৈরি করেন। সোভিয়েত পদার্থবিদ্ কুরসাভভের নামানুসারে কুরসাটোভিয়াম (Kurtchatovium) নামকরণ করা হয়।

১০৫ ও ১০৬ পারমাণবিক সংখ্যার মৌল দুটি সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ১৯৭০ ও ১৯৭৪ সালে আবিষ্কার করেন। প্রথমটি আমেরিকিয়ামকে নিয়নের আয়ন দ্বারা আঘাত করে এবং দ্বিতীয়টি সীসাকে ক্রোমিয়ামের আয়ন দ্বারা আঘাত করে তৈরি করা হয়। ১০৫ পারমাণবিক সংখ্যক মৌলটিকে বিজ্ঞানী নিলস্ বোরের নামানুসারে নিলসবোরিয়াম (Nielsbohrium) নামকরণ করা হয়। ১০৬ পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটির নামকরণ সম্বন্ধে এখনও জানা যায় নি।

banglainternet.com

কঠিন

বোরন (B), Z=৫

১৮০৮ সালে বিজ্ঞানী ডেভী এবং প্রায় একই সময় বিজ্ঞানী গে-লুসাক এই মৌলটি আবিষ্কার করেন। এই মৌলটির যৌগ সোহাগা (Borax) অনেক আগে থেকেই পরিচিত ছিল। এই বোরাক্স থেকেই মৌলটির বোরন (Boron) নামকরণ করা হয়।

প্রকৃতিতে বোরনকে স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ অথবা অনিয়তাকার চূর্ণ হিসেবে দেখা যায়। এই স্ফটিকের কাঠিন্য হীরকের মতোই। এর গলনাঙ্ক ২৩০০° সে. এবং স্ফুটনাঙ্ক ২৫৫০° সে.। প্রকৃতিতে বোরন সাধারণত বোরিক এসিড ও বিভিন্ন বোরেট হিসেবে থাকে। ভূত্বকে বোরনের পরিমাণ ৫×১০^{-৬}%. এবং শিলামণ্ডলে ও পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ৩×১০^{-৪}%.।

ইস্পাত কিংবা অন্য কোনো ধাতুতে অল্প পরিমাণ বোরনের উপস্থিতি এদের কাঠিন্য বৃদ্ধি করে। চীনামাটি ও অদাহ্য কাচে বোরন থাকে।

কার্বন (C), Z=৬

কার্বনের বিভিন্ন রূপ অতি প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত। সকল জৈবিক পদার্থেই কার্বন বিদ্যমান থাকে। এটি হাইড্রোকার্বন ও কারবোহাইড্রেট যৌগ গঠন করে। সুগন্ধি দ্রব্য, ওষুধ, প্রাণীর ও উদ্ভিদের দেহ নিঃসৃত পদার্থে, খাদ্য, কাঠ, কয়লা, গ্যাসীয় জ্বালানি প্রভৃতিতে কার্বন থাকে। পৃথিবীর, সকল জীবের জীবন নির্ভর করে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রসায়নের উপর। জ্বালানিতে কার্বনের জারন থেকেই প্রায় সমস্ত রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন হয়। খাদ্যে কার্বনের জারনের ফলে যাবতীয় জৈব্য প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রাসায়নিক শক্তি পাওয়া যায়।

ভূত্বকে প্রধানত কার্বন গ্রাফাইট ও হীরকরূপে থাকে। শিলামণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ ০.১%. আর ভূত্বকে ০.৩৫%.। পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ও লৌহ-উল্কাপিণ্ডে কার্বনের পরিমাণ যথাক্রমে ০.১১%. ও ০.০৪%.।

কার্বনের বহুরূপতা (কোনো পদার্থের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা ও বিন্যাসের পার্থক্যের জন্য সৃষ্ট ভিন্নরূপ) হলো হীরক ও গ্রাফাইট। গ্রাফাইটকে

উচ্চ চাপে নির্দিষ্ট ধাতব অনুঘটকের উপস্থিতিতে উচ্চ চাপে ২০০০—৩০০০° সে. পর্যন্ত তাপ দিলে তা হীরকে রূপান্তরিত হয়। গ্রাফাইটের গলনাঙ্ক ৩৬০০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ৪২০০° সে. বলে ধরা হয়।

কার্বন-১৪ আইসোটোপটি তেজস্ক্রিয় তারিখ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সিলিকন (Si), Z=১৪

১৮২৩ সালে বিজ্ঞানী বেরজিলিয়াস সিলিকন (Silicon) আবিষ্কার করেন। এর দুইটি রূপভেদ আছে। সিলিকা ও সিলিকেটসমূহে এটি যৌগিক আকারে থাকে। রাসায়নিক ধর্মের দিক দিয়ে সিলিকন কার্বনের অনুরূপ। ভূত্বকে সিলিকনের পরিমাণ ২৬%, আর শিলামণ্ডলে ২৭·৭%। এর গলনাঙ্ক ১৪২০° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক ২৩৫৫ সে.।

কোনো ধাতুকে কঠিন ও মরিচা প্রতিরোধক করতে সিলিকন ব্যবহার করা হয়। সিলিকন রবার, উড়োজাহাজের হাইড্রোলিক ব্যবস্থার তরল পদার্থসমূহে ও বার্নিশ তৈরিতে বিভিন্ন সিলিকন যৌগের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

ফসফরাস (P), Z=১৫

১৬৬৯ সালে আলকেমিস্ট ব্রাণ্ড এই মৌলটি আবিষ্কার করে 'ঠাণ্ডা আগুন' নামকরণ করেন। গ্রীক শব্দ Phos ও Phoros (আলো বহনকারী) শব্দ থেকে এর বর্তমান ফসফরাস (Phosphorus) নামকরণ।

ফসফরাস বহুরূপতা প্রদর্শন করে। এর পাঁচটি রূপভেদের মধ্যে তিনটিই বেশি পরিচিত। সাদা ফসফরাস বিষাক্ত পদার্থ। বাতাসে নিজ থেকেই জ্বলে ওঠে এবং নিম্ন তাপমাত্রায় ও অন্ধকারে প্রভা বিস্তার করে। লাল ফসফরাস চূর্ণ সাদা ফসফরাসের তুলনায় কম ক্রিয়াশীল এবং বিষাক্ত নয়। কাল ফসফরাস নামেও এর একটি রূপভেদ আছে। সাদা ফসফরাসের গলনাঙ্ক ৪০° সে. এবং স্ফুটনাঙ্ক ২৮০° সে.।

ফসফরাস অল্প পরিমাণে বহুব্যাপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এটি মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। কিন্তু যৌগিক অবস্থায় যেমন ক্যালসিয়াম ফসফেট হিসেবে অ্যাপেটাইট (Apatite) ও ফসফরাইট (Phosphorite) আকরিকে পাওয়া যায়। ভূত্বকে এবং শিলামণ্ডলে ফসফরাসের পরিমাণ ০·১২%, আর উল্কাপিণ্ডে ০·১৬%।

banglainternet.com

ফসফরাস প্রোটোপ্লাজমের একটি উপাদান বলে ধাতুটি জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। সার হিসেবে, দিয়াশলাই তৈরিতে, বিষ এবং কতিপয় সংকর ধাতুতে এটি ব্যবহৃত হয়।

গন্ধক (S), Z=১৬

গন্ধক অতি প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত। গাঢ় বর্ণের অনিয়তাকার ও হলুদ বর্ণের দুই ধরনের স্ফটিকাকার অবস্থায় এটি দেখা যায়। প্রকৃতিতে গন্ধক মৌলিক অবস্থায়, ধাতুর সালফাইড হিসেবে এবং সালফেটরূপে বিপুল পরিমাণে ও বহুব্যাপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। ভূত্বকে এর পরিমাণ ০·১০%. আর শিলামণ্ডলে ০·০৫%। পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ০·১৬%. গন্ধক দেখা যায়।

প্রাণী এবং উদ্ভিদজগতের অতি প্রয়োজনীয় বহু জৈব অণুর উপাদান হলো গন্ধক। রবার, দিয়াশলাই শিল্পে এবং রঙ তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। রসায়ন শিল্পে বর্তমানে উৎপাদনের মূল লক্ষ্যসমূহের মধ্যে একটি হলো সালফিউরিক এসিড উৎপাদন। কেননা এর সিংহ ভাগই ব্যবহৃত হয় অ্যামোনিয়াম সালফেট, ফসফরিক এসিড, সুপারফসফেট তৈরিতে এবং পেট্রোলিয়াম শোধনাগারে। সালফার ডাই-অক্সাইড কাগজ শিল্পে বিরঞ্জক হিসেবে এবং খাদ্যশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

আর্সেনিক (As), Z=৩৩

ধাতুকে জেণ্ডারে বিভক্ত করার চেষ্টায় রত প্রাচীন গ্রীকবাসীরা প্রাকৃতিক আর্সেনিক সালফাইডকে আর্সেনিকন (Arsenikon) নামকরণ করেন। (গ্রীক ভাষায় arsony—পুরুষ)। ১৯৫০ সালে এই মৌলটির আবিষ্কারক হিসেবে আলবের্টাস ম্যাগনাসের (Albertus Magnus) নাম অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়।

আর্সেনিক প্রকৃতিতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। একে মৌলিক অবস্থায়, সালফাইড রূপে, আর্সেনাইড রূপে দেখা যায়। এর প্রধান আকরিক হলো আর্সেনোপাইরাইট (Arsenopyrite)। শিলামণ্ডলে এবং ভূত্বকে আর্সেনিকের পরিমাণ ৫×১০^{-৪}%. আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ২×১০^{-৬}%।

আর্সেনিকের তিনটি রূপভেদ আছে। নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের সাথে আর্সেনিকের মিল রয়েছে। এই মৌলটি ও এর যৌগসমূহ রঙ, কাচ, আগাছাধ্বংসী বিষ, কীটনাশক ওষুধ এবং বিষাক্ত গ্যাস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কাপড় রঙ দেয়া, চামড়া পাকা করা এবং ওষুধে এটি ব্যবহৃত হয়। ধাতুটি তীব্র বিষ।

সিলিনিয়াম (Se), Z=৩৪

বিজ্ঞানী বেরজিলিয়াস ১৮১৭ সালে এই মৌলটি আবিষ্কার করেন। রাসায়নিক গুণাবলী টেলুরিয়ামের মতো বলে (Tellus-পৃথিবী) একে (Selene -চাঁদ) সিলিনিয়াম (Selenium) নামকরণ করেন। সিলিনিয়াম সাধারণত সালফাইড আকরিকসমূহে, যেমন পাইরাইট, চ্যালকোপাইরাইট (Chalcopyrite), জিংক ব্লাণ্ডে পাওয়া যায়। ভূত্বকে এর পরিমাণ 8×10^{-5}%।

সিলিনিয়াম বহুরূপী, সাধারণত লাল চূর্ণ, লাল স্ফটিকাকার এবং ধূসর ধাতবাকার হয়। আলোর প্রভাবে সিলিনিয়ামের তাপ এবং বিদ্যুত সঞ্চালন শক্তি বৃদ্ধি পায় এই জন্য ফটোইলেকট্রিক যন্ত্রে, টেলিভিশনে, এমনকি রাস্তার বৈদ্যুতিক বাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বালানো এবং নিভানোর জন্য সিলিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। আর্সেনিকের যৌগের মতো সিলিনিয়ামের যৌগও বিষাক্ত। এর সংস্পর্শে একজিমা হওয়ার আশংকা থাকে।

ব্রোমিন (Br), Z=৩৫

১৮২৬ সালে সামুদ্রিক লবণ উৎপাদনের সময় বিজ্ঞানী বালার্ড (Balard) দ্রবাবশেষে (Mother liquor) এই মৌলটি আবিষ্কার করেন। মৌলটির তীব্র গন্ধের জন্য এর (গ্রীক শব্দ Bromos-দুর্গন্ধ) ব্রোমিন (Bromine) নামকরণ করেন। প্রকৃতিতে ব্রোমিন সাধারণত সাগরের পানি, বিভিন্ন খনিজ উৎসে ও সাধারণ লবণের স্তূপে যৌগিক অবস্থায় থাকে। শিলামণ্ডলে এর পরিমাণ ১.৬×১০^{-৪}%, ভূত্বকে $১০^{-৩}$% ও পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ২.৫×১০^{-৩}%।

ব্রোমিন গাঢ় লাল তরল পদার্থ। এর বাষ্পে শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধ আছে। ত্বকের সংস্পর্শে এলে এটি যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করে। মৌলটি মাইনাস ৭° সে. কঠিন হয় এবং ৫৮.৮° সে. বাষ্পে পরিণত হয়।

banglainternet.com

ব্রোমিন প্রধানত জৈব ও অজৈব যৌগিক পদার্থ উৎপাদনে—পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয়। বীজাণুনাশক ওষুধ হিসেবে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

আয়োডিন (I), Z=৫৩

সমুদ্র তীরবর্তী আগাছার ছাই থেকে উৎপাদিত সোডাতে, ১৮১১ সালে প্যারিসের এক সল্টপিটার মিল-মালিক কোরটুয়া (Courtois) এই মৌলটি আবিষ্কার করেন। ১৮১৩ সালে গে-লুসাক মৌলটি নিয়ে গবেষণা করে ক্লোরিনের সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। ধূসর বর্ণের জন্য তিনি (গ্রীক শব্দ Iodes—ধূসর) একে আয়োডিন (Iodine) নামকরণ করেন। সাধারণ তাপমাত্রায় আয়োডিন কঠিন পদার্থ। যদিও ১১৩·৭° সে. এটি গলতে শুরু করে তথাপি এই তাপমাত্রার অনেক নিচেই সে ঊর্ধ্বপাতিত হয়। এর বাষ্প বিষাক্ত। লবণ খনিতে ও বিশেষ বিশেষ সামুদ্রিক উদ্ভিদে আয়োডিন পাওয়া যায়। চিলির সল্টপিটার আয়োডিনের প্রধান উৎস। ভূত্বকে আয়োডিনের পরিমাণ $১০^{-৪}$%, আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ১.২৬ × $১০^{-৪}$%।

বহু জৈব ও অজৈব যৌগিক পদার্থ তৈরিতে আয়োডিন ব্যবহৃত হয়। আয়োডিন ও এর যৌগ ওষুধ তৈরিতে, গলগণ্ড রোগের চিকিৎসায়, পচন নিবারকরূপে, রঞ্জক প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়।

গ্যাসীয়

হাইড্রোজেন (H), Z=১

বিশ্বের সকল পদার্থের মূল হলো হাইড্রোজেন। পর্যায় সারণীর প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা হালকা মৌলিক পদার্থ। ষোড়শ শতাব্দীতেও অনেক বিশেষজ্ঞরা এই মৌলটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন কিন্তু সঠিকভাবে সর্বপ্রথম ১৭৮১ সালে বিজ্ঞানী ক্যাভেনডিশ এই মৌলটি আবিষ্কার করেন। হালকা এসিডে ধাতুসমূহ দ্রবীভূত করার সময় এক প্রকার দাহ্য গ্যাস নির্গত হতে তিনি লক্ষ্য করেন। এটিই ছিল হাইড্রোজেন। ১৭৮১ সালে তিনিই প্রমাণ করেন যে পানি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের যৌগ। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন বিদ্যমান। শিলামণ্ডলে এর পরিমাণ ০.১৫%, ভূত্বকে ১·০% এবং পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ০·০৬৩%। তবে ভূপৃষ্ঠের একশো

banglainternet.com

কিলোমিটারের উপরে আবহমণ্ডলে একমাত্র হাইড্রোজেনই রয়েছে। প্রোটিয়াম (হালকা হাইড্রোজেন), ডয়েটেরিয়াম (ভারি হাইড্রোজেন) ও ট্রিটিয়াম হাইড্রোজেনের আইসোটোপ। সাধারণ পানিতে ডয়েটেরিয়ামের পরিমাণ ০.০১৫%। অন্য দিকে নক্ষত্রসমূহের একমাত্র জ্বালানি হলো হাইড্রোজেন, আর এই হাইড্রোজেন পুড়েই সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র বেঁচে আছে কোটি কোটি বছর।

তরল হাইড্রোজেন স্বচ্ছ ২০·৩৯°K তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়। আরো নিম্ন তাপমাত্রায় কঠিনাকার ধারণ করে এবং ১৩·৯৫°K তাপমাত্রায় গলতে থাকে। বিভিন্ন ফিজিকো-ক্যামিকেল গবেষণায় তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয়। বহু রাসায়নিক যৌগের উপাদান এই হাইড্রোজেন।

হিলিয়াম (He), Z=২

১৮৬৮ সালে ফরাসী জ্যোতির্বিদ জানসেন সৌরমণ্ডলের বর্ণালীতে এই মৌলটি আবিষ্কার করেন। তখনও পৃথিবীতে এই মৌলটির সন্ধান মেলে নি। তাই ইংরেজ জ্যোতির্বিদ লকের ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড ১৮৬৯ সালে গ্রীক শব্দ helios (সূর্য) থেকে মৌলটিকে হিলিয়াম (Helium) নামকরণ করেন। কেবল ১৮৯৫ সালে বিজ্ঞানী রামযাই ইউরেনিয়ামের ক্লেভেয়াইট (Cleveite) আকরিকে হিলিয়াম নিরূপণ করেন। বায়ুমণ্ডলে হিলিয়ামের পরিমাণ মাত্র ০·০০০৫%। তাই একে বিরল গ্যাস বলা হয়। ভূত্বকে এর পরিমাণ মাত্র $১০^{-৬}$%। হিলিয়ামের দুটি স্থায়ী আইসোটোপ ছাড়াও দুইটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। বিরল গ্যাসটি ১.১৩°K তাপমাত্রায় কঠিনাবস্থায় থাকে আর ৪.২১৬°K এ বাষ্পীভূত হয়। তরল হিলিয়ামের পরিবাহকত্ব ও তরলতা খুব বেশি। এই বিরল গ্যাসটি কিছু সংখ্যক রিঅ্যাকটরে হিমায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টির জন্য এবং বিভিন্ন রাসায়নিক গবেষণায় নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিসেবে প্রচুর পরিমাণে হিলিয়াম ব্যবহার করা হয়। অক্সিজেন ও হিলিয়ামের নির্দিষ্ট মিশ্রণ অনেক রোগীকে নিঃশ্বাস গ্রহণে দেয়া হয়।

নাইট্রোজেন (N), Z=৭

বিজ্ঞানী ডি. রেজেরফোর্ড ১৭৭২ সালে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী ল্যাবুয়াজে মৌলটিকে প্রথমে 'মৃত বায়ুমণ্ডল' ও পরবর্তীতে

banglainternet.com

গ্রীক শব্দ azoos (শ্বাসরোধী) থেকে আজোত নামকরণ করেন। বর্তমান ল্যাটিন নাম নাইট্রোজেনিয়াম (Nitrogenium) অর্থাৎ সল্টপিটার (পটাসিয়াম নাইট্রেট) তৈরিকারক। এটি বর্ণ ও গন্ধহীন গ্যাস। বায়ুমণ্ডলের ৭৮%-ই নাইট্রোজেন। শিলামণ্ডলে এর পরিমাণ ০·০১%, ভূত্বকে ০·০৪%, আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ৯×১০$^{-২}$%। নাইট্রোজেন সাধারণত দুটি স্থায়ী আইসোটোপের মিশ্রণ। এ ছাড়াও চারটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। সাধারণত তরল বাতাসকে আংশিক পাতন করে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। এর গলনাঙ্ক মাইনাস ২০৯·৯°সে. আর স্ফুটনাঙ্ক মাইনাস ১৯৫·৬৭° সে.। এই তরল নাইট্রোজেন হিমায়ক হিসেবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের বহু যৌগ, যেমন অ্যামোনিয়া, হাইড্রোক্সিল অ্যামাইন, হাইড্রাজিন প্রচুর পরিমাণে রসায়ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বহু জৈব পদার্থে নাইট্রোজেন বিদ্যমান থাকে। উদ্ভিদদেহেও নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা অনেক।

অক্সিজেন (O), Z=৮

অক্সিজেন আবিষ্কারের পূর্বে বাতাসকে একটি মৌলিক পদার্থ হিসেবেই গণ্য করা হতো। বিজ্ঞানী শীলে ১৭৭৭ সালে সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণামূলক 'বাতাস ও আগুন' প্রবন্ধে বায়ুকে মিশ্র পদার্থ বলে উল্লেখ করেন এবং এই মিশ্রণ থেকে কেবল একটি মাত্র পদার্থ দহন ও শ্বাস কার্যে অংশ নেয়ার সঠিক ধারণা ব্যক্ত করেন। তিনিই ১৭৭১ সালে সল্টপিটার ভস্মীকরণ করে এবং সাল্ফিউরিক এসিড থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন পান। আলাদাভাবে ১৭৭৪ সালে বিজ্ঞানী প্রিস্টলী পারদ অক্সাইড ও লাল সীসা থেকে এই অক্সিজেন সংশ্লেষণ করেন। আর বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে উক্ত মৌলটির বিভিন্ন ধর্মাবলী নিয়ে গবেষণা করেন। মৌলটিকে এসিডের মূল উপাদান ভেবে তিনি Principe acidifiant অথবা Oxygene নামকরণ করেন। যদিও পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে যে অনেক এসিডের উপাদানে অক্সিজেন নাও থাকতে পারে। তথাপি ঐ নামকরণ এখনও প্রচলিত রয়েছে। অক্সিজেন জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের প্রধান অংশই শ্বাসকার্য ও দহনে ব্যবহৃত হয়। এতে অনেক অক্সিজেন খরচ হলেও সূর্যালোকে উদ্ভিদের সবুজ অংশে আলোক-সংশ্লেষনের ফলে অনবরত

banglainternet.com

অক্সিজেনে পরিপূর্ণ হয়। শুষ্ক বায়ুতে ২৩·/. অক্সিজেন থাকে। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ ৮৮·৮১·/.. ভূত্বকে ৪১·/.. শিলামণ্ডলে ৪৭·/. ও পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ৪৯·৩·/.। প্রকৃতিতে অক্সিজেন হলো তিনটি স্থায়ী আইসোটোপের মিশ্রণ। এ ছাড়াও অক্সিজেনের পাঁচটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আছে। অক্সিজেন বর্ণ ও গন্ধহীন গ্যাস। ৫৪·৬৯°K-এ অক্সিজেন কঠিনাকার ধারণ করে আর ৯০·১৬°K-এ বাষ্পীভূত হয়। রসায়ন শিল্পে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণে অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। হাইড্রাজিন, ইথাইলঅ্যালকোহল অথবা নাইট্রোমিথেনের সাথে তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ রকেটের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফ্লোরিন (F), Z=৯

১৭৭১ সালে বিজ্ঞানী শীলে ফ্লোরিন আবিষ্কার করেন। ১৮৮৬ সালে বিজ্ঞানী মোসানডের এই মৌলটি নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন। তখন প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এই মৌলটির যৌগ ফ্লোরাইট-এর (যা মেটালোর্জিতে ফ্লিউজিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে) নামানুসারে মৌলটিকে ফ্লোরিন (Fluorine) নামকরণ করা হয়। হলদে সবুজ রঙের ফ্লোরিন গ্যাস তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। একটি স্থায়ী আইসোটোপবিশিষ্ট ফ্লোরিনের পাঁচটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। মাইনাস ১৮৮° সে. ফ্লোরিন তরল থাকে আর মাইনাস ২২৩° সে. কঠিনাকার ধারণ করে। প্রধানত ফ্লোরাইট (Fluorite) ও ক্রিওলাইট (Cryolit) হিসেবে ফ্লোরিনকে পাওয়া যায়। ভূত্বকে ফ্লোরিনের পরিমাণ ০·০৮·/. ও পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ৪×১০$^{-৩}$·/.। ফ্লোরিন এবং এর যৌগ ব্যাপকভাবে কাচ ও সিরামিক শিল্পে ইউরেনিয়ামের বিভিন্ন আইসোটোপ পৃথকীকরণে, ইস্পাত পরিষ্কার করতে, ডাইইলেকট্রিক হিসেবে, কীটনাশক ওষুধ তৈরিতে এবং পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয়।

banglainternet.com

নিয়ন (Ne), Z=১০

১৮৯৮ সালে বিজ্ঞানী রামযাই তরল বায়ুকে আংশিক পাতনের মাধ্যমে নিয়ন আবিষ্কার করেন। প্রাকৃতিক নিয়ন তিনটি স্থায়ী আইসোটোপের মিশ্রণ। এছাড়াও নিয়নের পাঁচটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। তরল নিয়ন ২৭·১৭°K-এ বাষ্পীভূত হয়। আর কঠিন নিয়ন ২৪·৫৭°K-এ গলতে

শুরু করে। নিয়ন বিরল গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে নিয়নের পরিমাণ ১·৮×১০$^{-৩}$%. আর ভূত্বকে ৫×১০$^{-৯}$%.। নিয়ন গ্যাস বিপুল পরিমাণে লালচে কমলা রঙের আলোর জন্যে বৈদ্যুতিক বাল্‌বে ব্যবহৃত হয়।

ক্লোরিন (Cl), Z=১৭

১৭৭৪ সালে বিজ্ঞানী শীলে এই গ্যাসটি আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী ডেভী ১৮০৭ সালে একে নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন এবং এর হলদে সবুজ রঙের জন্য গ্রীক শব্দ 'Chloros অর্থাৎ সবুজ' থেকে নামকরণ করেন ক্লোরিন (Chlorine)। ক্লোরিনের দুইটি স্থায়ী আইসোটোপ ছাড়াও সাতটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। ক্লোরিন সাধারণত ক্লোরাইড হিসেবে সমুদ্রের পানিতে থাকে। ভূত্বকে ক্লোরিনের পরিমাণ ০·২০%. শিলামণ্ডলে ০·৩%. আর পাথুরে উল্কাপিণ্ডে ০·০৯%.। ক্লোরিন গ্যাস মাইনাস ৩৪·৬° সে.-এ তরল হয় আর কঠিন ক্লোরিন মাইনাস ১০২° সে. তাপমাত্রায় গলতে শুরু করে। ক্লোরিন গ্যাস শ্বাসপথে প্রদাহ সৃষ্টি করে। বিরঞ্জক হিসেবে, পানির জীবাণুনাশ করতে এবং বেশ কিছু জৈব পদার্থ তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরিন ব্যবহৃত হয়।

আরগন (Ar), Z=১৮

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে প্রকৃতিতে আরগনের বিস্তৃতিই ব্যাপক। ১৮৯৪ সালে বিজ্ঞানী রেলে ও রামযাই আরগন আবিষ্কার করেন। আরগনের তিনটি স্থায়ী আইসোটোপ ছাড়াও সাতটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। কঠিন আরগনের গলনাঙ্ক ৮৩·৮৫°K আর স্ফুটনাঙ্ক ৮৭·২৯°K। বায়ুমণ্ডলে আরগনের পরিমাণ ০·৯৩%. আর ভূত্বকে ৪×১০$^{-৪}$%.।

বিভিন্ন ধাতু নিষ্ক্রিয় পরিবেশে কাটতে ও গলাতে আরগন ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক বাল্‌বে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক গবেষণায় আরগন গ্যাস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্রিপটন (Kr), Z=৩৬

১৮৯৮ সালে বিজ্ঞানী রামযাই ও ট্রাভেরস তরল বায়ুকে আংশিক পাতনের মধ্য এই বিরল গ্যাসটি আবিষ্কার করেন। ক্রিপটনের ছয়টি স্থায়ী আইসোটোপ ছাড়াও প্রায় আঠারোটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। এর গলনাঙ্ক

১১৬·৫°K আর স্ফুটনাঙ্ক ১১৯·৯৩°K। বায়ুমণ্ডলে ক্রিপটনের পরিমাণ ১·৫×১০$^{-৪}$%। আর ভূত্বকে ২×১০$^{-৮}$%। প্রতিপ্রভ নলে, ফ্ল্যাশবাল্বে সাদা আলোর উৎস হিসেবে, শিল্পক্ষেত্রে ক্রিপটন ব্যবহার করা হয়।

জেনন (Xe), Z=৫৪

একই সময়ে ক্রিপটনের সাথে বিজ্ঞানী রামযাই ও ট্রাবেরস জেনন আবিষ্কার করেন। এই মৌলটির নয়টি স্থায়ী ও আঠারোটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রয়েছে। এর স্ফুটনাঙ্ক ১৬১·৬°K। বায়ুমণ্ডলে জেননের পরিমাণ ৮×১০$^{-৬}$%। আর ভূত্বকে ৩×১০$^{-৯}$%। কোনো কোনো ইউরেনিয়ামের আকরিকে এই মৌলটির কিছু আইসোটোপ পাওয়া যায়। এই আইসোটোপ পরিমাপ করে উক্ত আকরিকগুলির বয়স নির্ধারণ করা যায়। জেননের সাধারণ ব্যবহার ক্রিপটনের ব্যবহারের মতোই।

র‍্যাডন (Rn), Z=৮৬

অভিজাত গ্যাসের মধ্যে র‍্যাডনই সবচেয়ে ভারি। এর প্রথম আইসোটোপটি বিজ্ঞানী ওয়েনসন ১৮৯৯ সালে আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন নিউক্লীয় বিক্রিয়ার সাহায্যে প্রায় বিশটিরও বেশি আইসোটোপ পাওয়া গেছে। র‍্যাডনের গলনাঙ্ক মাইনাস ৭১° সে. আর স্ফুটনাঙ্ক মাইনাস ৬১° সে.। বায়ুমণ্ডলে র‍্যাডনের পরিমাণ ৬×১০$^{-১৮}$%। রেডিয়াম নিরূপণে, ফিল্টারের গুণাবলী নিরূপণে ও নিউট্রন সংশ্লেষণে র‍্যাডন ব্যবহার করা হয়।

banglainternet.com

মেনডেলিভ তাঁর পর্যায় সূত্রকে সুত্রবদ্ধ করেছিলেন প্রধানত রাসায়নিক মৌলের ধর্মের পরিবর্তন ও তাদের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ওজনের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু মোজলি প্রমাণ করলেন ওজন নয় বরং নিউক্লিয়াসের আধানের উপর নির্ভর করে মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্মাবলী। আর বোর পরমাণু অন্তর্গত ইলেকট্রনের উপর জোর দিলেন। কিন্তু আইসোটোপ আবিষ্কারের পর মৌলের পর্যায়গত ধর্মের পরিবর্তন খুঁজতে বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়াসের উপর দৃষ্টিপাত করলেন। কেননা আইসোটোপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে নিউক্লিয়াসের মডেলের কথা ভাবতে হয়। ১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কারের পর নিউক্লিয়াসের গঠনে প্রোটন নিউট্রন নক্সাই সর্বজনে স্বীকৃত হলো। দেখা গেল যে আবিষ্কৃত মৌলের তিন চতুর্থাংশ মৌলে এমনকি কোনো কোনো মৌলে আবার একাধিক আইসোটোপ থাকে। এরপর বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় রেডিও এক্টিভ (তেজস্ক্রিয়) আইসোটোপ সংশ্লেষণে ব্যস্ত হলেন।

বর্তমানে প্রায় উনিশ শোরও বেশি বিভিন্ন ধরনের পরমাণু (স্থায়ী ও তেজস্ক্রিয়) নিউক্লিয়াসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রকৃতিতে আবিষ্কৃত ৮৯টি মৌলের ৩২৫টি আইসোটোপ। প্রকৃতিতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সংখ্যা কম বলে সবার ধারণা ছিল। কিন্তু ইউরেনিয়াম-২৩৮ সিরিজে ১৭টি, ইউরেনিয়াম-২৩৫ সিরিজে ১৪টি ও থোরিয়ামের সিরিজে ১১টি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সন্ধান মিলেছে। ক্যালসিয়াম-৪০ ও রুবিডিয়াম-৮৭ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। বায়ুমণ্ডলে অনবরত তৈরি হচ্ছে কার্বন-১৪ ও হাইড্রোজেন-T। ২৮০ টি প্রাকৃতিক আইসোটোপকে স্থায়ী বলে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু এর পরেও এদের মধ্যে বিশটির বেশি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সন্ধান মিলেছে। এদের মধ্যে ক্যালসিয়াম ৪৮-এর জীবন সীমা $১০^{২১}$—$১০^{২২}$ বছর। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা যখন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হলেন তখন এদের সংখ্যা ক্রমে দাঁড়াল প্রায় ১৬০০-তে।

রীতিবদ্ধ গবেষণার পর জানা গেল যে নিউক্লিয়াসে, পরমাণুতে ইলেকট্রনের মতোই প্রোটন ও নিউট্রন বিভিন্ন শক্তির স্তরের শেলে বিদ্যমান থাকে।

banglainternet.com

যা নিউক্লিয়াসের শেল মডেল নামে পরিচিত। নিউক্লিয়নের (প্রোটন ও নিউট্রন) সংখ্যাই পরমাণু নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব ও ধর্মের পর্যাবৃত্তি নির্ধারণ করে। বিশেষ করে এই নিউক্লিয়নের সংখ্যা যখন ২, ৮, ২০, ৫০, ৮২, ১১৪, ও ১২৬ হয় তখন নিউক্লিয়াসের নিউট্রন ও প্রোটন শেল খুব স্থায়ী হয়। উক্ত নিউক্লিয়াসকে 'ঐন্দ্রজালিক নিউক্লিয়াস' বলা হয়। এই ঐন্দ্রজালিক মৌলের আইসোটোপগুলিই সাধারণত প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। তারা যথেষ্ট স্থায়ী, এই নিউক্লিয়াসগুলি নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় নিউট্রন দখলে নিষ্ক্রিয়। দেখা গেছে যে ঐন্দ্রজালিক সংখ্যার উপর নির্ভর করে নিউক্লিয়াসের কিছু কিছু ধর্ম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। পর্যায় সারণীর নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ঐন্দ্রজালিক নিউক্লিয়াসগুলির পর্যায় এর সমাপ্তি ঘটে।

বর্তমানে সকল সম্ভাব্য নিউক্লিয়াসগুলির মাত্র এক চতুর্থাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সুতরাং নিউক্লিয়াসের উপর নির্ভর করে পদার্থের ধর্মের কোনো সাধারণ নিয়মানুবর্তিতা খুঁজে পাওয়া কখন সম্ভব হবে বলা কঠিন। তথাপি সম্ভাবনার ইতিবাচ্যও করা যায় না।

বর্তমানে গবেষকরা মাত্র ১০৬টি মৌল পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁদের আয়ত্তে এনেছেন। কিন্তু একটা সাধারণ প্রশ্ন সবার মনেই জাগে যে কখন এই নতুন মৌলের আবিষ্কারের সমাপ্তি ঘটবে? ১০৬ নম্বর মৌলটির অর্ধ-জীবন-সীমা $১০^{-২}$ সেকেণ্ড। আর বিজ্ঞানীরা মনে করেন যখন নিউক্লিয়াস গঠনের পর মুহূর্তেই ($১০^{-২০}$ সেকেণ্ডে) বিযুক্ত হয়ে যাবে তখন নতুন মৌলের জন্ম বন্ধ হবে। সুতরাং ১০৬ নম্বর মৌলটি অবশ্যই শেষ মৌল নয়। ট্রান্স ইউরেনিয়াম মৌলগুলির সাফল্যপূর্ণ সংশ্লেষণ ও তাদের ধর্মাবলী অধ্যয়নের পর পদার্থবিদ্‌রা হতাশাজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে সম্ভবত ১০৮-১১০ নম্বরেই হবে শেষ মৌলটি। ধারণা করা হয়েছিল যে উক্ত মৌলগুলির নিউক্লিয়াস হবে অস্থায়ী সুতরাং মৌলের শেষ সীমা খুব কাছেই।

banglainternet.com

আমাদের জানা আছে যে বিজ্ঞানীরাও অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত করে থাকেন। সুতরাং উল্লিখিত সিদ্ধান্তও ভুল হতে পারে। যেমন কয়েক দশক বছর আগে যখন কৃত্রিম উপায়ে মৌলের সংশ্লেষণ শুরু হয় নি তখন বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন জাগতো ইউরেনিয়ামের পরে ভারি কোনো মৌলের অস্তিত্ব নিয়ে। অনেক গবেষকরা সরাসরি উত্তর করেছিল অসম্ভব, কেননা এই সব মৌলগুলি তাদের তেজস্ক্রিয়তার জন্য জন্মের পরেই বিযুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত

হালকা মৌলে পরিবর্তন হতো। কিন্তু কতিপয় বিজ্ঞানী উল্টো মন্তব্যতে দৃঢ় ছিলেন। সত্যিকারে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির মধ্যে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম সবচেয়ে ভারি এবং তাদের জীবন-সীমাও বেশি। সুতরাং একথা অবশ্যই বলা যায় না যে মৌলের ওজন যত বেশি তার তেজস্ক্রিয়তাও তত অধিক হবে। ট্রান্স ইউরেনিয়াম মৌলগুলির জীবন সীমা ইউরেনিয়ামের জীবন-সীমার চেয়ে কম হবে কেন? তখন গবেষকরা এর জবাব কোনো মৌলের নিয়মানুবর্তিতার মাঝে খুঁজে পায় নি। কেননা পালেনিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত মৌলগুলির অর্ধ-জীবন-সীমা নিয়ম বহির্ভূত ছিল। তথাপি রিখার্ডস্বিন্নে এদের মধ্যে কোনো নিয়মানুবর্তিতা খুঁজে পেতে চাইলেন। সারা জীবনের গবেষণার উপসংহারে তিনি তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির মধ্যে আলফা ও বিটা বিকিরণের কম-বেশি পর্যায়নুবৃত্তি লক্ষ্য করলেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে কয়েকটি অল্প জীবন-সীমাসম্পন্ন আইসোটোপের পরেই আসে দীর্ঘ জীবন-সীমাসম্পন্ন আইসোটোপের শ্রেণী (স্থায়ী-দ্বীপ)। এই ধরনের এক দ্বীপেরই অন্তর্গত থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম। এই সিদ্ধান্তের পর তিনি ইউরেনিয়ামের পরবর্তী দীর্ঘ জীবন-সীমাসম্পন্ন আইসোটোপের স্থায়ী-দ্বীপের অজানা মৌলগুলির সন্ধানে লিপ্ত হলেন। ধারণা করলেন মৌলগুলি সম্ভবত ৯৮ — ১০২ ও ১০৮—১১০-এর মধ্যে হবে। তিনি গবেষণায় আর এক পদক্ষেপ এগিয়ে গিয়ে এই মৌলগুলিকে প্রকৃতিতে খুঁজতে শুরু করলেন। মহাজাগতিক ধূলার রঞ্জন রশ্মির বর্ণালীতে কিছু নূতন লাইনের সন্ধান পেলেন যা ১০৮ নম্বর মৌল বলে ধারণা করলেন। এই সময় কেউ স্বিন্নের উক্ত মন্তব্যে কর্ণপাত করলেন না।

অবশ্য এর অনেক পরে ১৯৬০ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা স্বিন্নের প্রকল্প ভিত্তিক নতুন গবেষণায় লিপ্ত হলেন। তারা খুঁজতে শুরু করলেন দীর্ঘ জীবন-সীমার স্থায়ী-দ্বীপ ও উচ্চ প্রোটন সংখ্যা (Z)-বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস। হিসাবের পর দেখা গেল যে প্রোটনের সংখ্যা Z=১১৪, ১২৬, ১৬৪ ও ১৮৪ আর নিউট্রনের সংখ্যা N=১৮৪, ৩১৮ অবশ্যই ঐন্দ্রজালিক হবে। এই ঐন্দ্রজালিক নিউক্লিয়াসগুলির জীবন সীমা হবে $১০^{১৫}$ বছর। এই প্রকল্পের ঐন্দ্রজালিক নিউক্লিয়াসের মৌলগুলিকে সুপার মৌল বলা হয়।

দুর্ভাগ্যবশত সুপার মৌলগুলি শুধু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিযুক্তই হয় না বরঞ্চ আলফা এবং বিটা বিকিরণও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মোটের

উপর এদের জীবন-সীমা অল্প সময়ের। অনেকে আবার এই সুপার মৌলগুলিকে প্রাকৃতিক পদার্থ যেমন উল্কা, মহাজাগতিক রশ্মি ও চাঁদের মাটিতে পাওয়ার আশা করেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত এখানে তা মিলে নি। বাস্তব সত্য বলতে গেলে যদি এই সুপার মৌল পরীক্ষাগারে সংশ্লেষণ করা সম্ভব হতো তখন স্থায়ী-দ্বীপের প্রকল্প তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করা যেতো।

সকল ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণী করে ১১৪ নং মৌলের $^{২৯৮}১১৪$ আইসোটোপট আবিষ্কার করাই ছিল বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য। যেহেতু আইসোটোপটি ১৮৪টি নিউট্রন ও ১১৪টি প্রোটন ধারণ করে দুবার ঐন্দ্রজালিক নিউক্লিয়াস তৈরি করে সুতরাং এতে নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। দ্রুতগামী ক্যালশিয়াম, আরগন অথবা সিলিকনের আয়ন দ্বারা ট্রান্স ইউরেনিয়ামের মৌলগুলিকে আঘাত করে ও পরীক্ষাগারে উল্লিখিত মৌলটি অথবা আইসোটোপটি তৈরি করা সম্ভব হলো না।

আকাঙ্ক্ষিত ১৮৪টি নিউট্রন ধারণকৃত ১২৬ নম্বর মৌলটি তত্ত্বগত সংশ্লেষণ যদিও সম্ভব তথাপি বহুমাত্রায় বিটা বিকিরণে সক্রিয় এবং নিম্নমানের অর্ধ-জীবন-সীমাসম্পন্ন হবে বলে এর নানাবিধ ধর্মাবলী পরীক্ষার সমস্যা দাঁড়াবে তাই প্রয়োজন এর গুরুত্বপূর্ণ ধর্মাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী করা। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও তা অপারগ আর ১৬৪ ও ১৮৪ নম্বর স্থায়ী-দ্বীপের ঐন্দ্রজালিক মৌলের সংশ্লেষণজনিত গবেষণা সম্বন্ধে মন্তব্য করা আরও কঠিন।

পদার্থবিদ্‌রা বর্তমান যুগে কম্পিউটারের সাহায্যে সুপার মৌলগুলির সম্ভাব্য ধর্মাবলী হিসেব করে বের করেছেন। অনেক বিজ্ঞানী আবার রসায়নের এই শাখাকে কম্পিউটার রসায়ন নামেও আখ্যায়িত করেছেন।

সব যেন গল্পের মতো মনে হয়। বিজ্ঞানীরা যদি ভুল না-করে থাকেন তবে অবস্থা তেমনি দাঁড়াবে।

একেবারে অসাধারণ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং রহস্যের বিস্ময়কর রাসায়নিক মৌল ও তাদের যৌগের পৃথিবী—এরই অপেক্ষায় বিজ্ঞানীরা, তাদের প্রধান কাজ পরীক্ষামূলক প্রমাণ করা 'স্থায়িত্ব সম্পর্কিত দ্বীপ কল্পনা' সুপার মৌলের সংশ্লেষণ এবং তাদের ধর্মাবলী বিশ্লেষণ, এ বিংশ শতাব্দীর উপকথা নয়।

—

banglainternet.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. হাইসিন্‌সকি এম. ও এডলফ যে. পি. : মৌলিক পদার্থের ধর্মাবলী, ব্যবহার ও তাদের আইসোটোপ (রুশ) ; অ্যাটমইযদাত, মস্কো (১৯৬৮)।

২. প্রেত্রিয়ানভ ই. বি. ও ব্রিকোনভ ডি. খ. : পর্যায়সূত্র (রুশ) ; পেদাগোগিকা, মস্কো (১৯৭৬)।

৩. ম্যানফ্রেড বেকের্ট : ধাতুর জগৎ (রুশ), মির, মস্কো (১৯৮০)।

৪. হেনরিক রেমী, অজৈব রসায়ন (১ম খণ্ড), মির, মস্কো (১৯৭২)।

৫. হেনরিক রেমী, অজৈব রসায়ণ (২য় খণ্ড), মির, মস্কো (১৯৭৪)।

৬. এনসাইক্লোপেডিয়া অব কেমিক্যাল টেকনোলোজি (৩য় সংস্করণ), ইণ্টার সায়েন্স, নিউইয়র্ক—লণ্ডন (১৯৮২), ১-২৪ খণ্ড।

৭. দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, লণ্ডন (১৯৮০), ১—১৯ খণ্ড।

৮. এনসাইক্লোপেডিয়া অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি, ম্যাক গ্রো হিল, নিউইয়র্ক (১৯৭০), ১—১৪ খণ্ড।

৯. বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন, ঢাকা (১৯৭২), ১—৪ খণ্ড।

১০. হাউ কেমিক্যাল এলিমেণ্টস ওয়েয়ার ডিসকভারড : এফিনভ ব., মির, মস্কো (১৯৭৮)।

banglainternet.com